কৃষ্ণপক্ষ

হুমায়ূন আহমেদ

ডিজিটাল বাংলা সাহিত্য
www.boimela.u4l.com

উৎসর্গ

অধ্যাপক মোঃ আবদুল বায়েছ ভূঞা
প্রিয়জনেষু

আমার ব্যালকনির জানালা বন্ধ করে রেখেছি
কারণ, কান্নার শব্দ আমার পছন্দ নয়।
তবু ধূসর দেয়ালের আড়াল থেকে
কান্না ছাড়া আর কোন কিছুরই শব্দ শোনা যায় না।

(লোরকা)

॥ ১ ॥

'নোটটা বদলাইয়া দেন আফা, ছিড়া নোট।'

অরুর গা বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কুড়ি টাকার একটা নোটই তার কাছে আছে। ছেড়া নোট বদলাবে কোত্থেকে ? অরু গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলল, কই দেখি নোটটা ? রিকশাওয়ালার মুখে অহংকার মেশানো বিজয়ীর হাসি। ছেড়া নোটটা আবিষ্কার করে সে খুব খুশী। যেন সে ক্রিষ্টফার কলম্বাস। আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

অরু বলল, কই আমি তো ছেড়া দেখছি না।

রিকশাওয়ালা তচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, নজর দিয়া দেহেন।

অরু 'নজর' দিয়ে দেখল। হ্যাঁ ছেড়া। ছিড়ে দুখণ্ড করা। স্কচ টেপ দিয়ে এত সাবধানে জোড়া লাগানো যে রিকশাওয়ালা ছাড়া অন্য কারো বোঝার উপায় নেই।

'কি আফা বিশ্বাস হইল ?'

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, শোন, আমার কাছে আর কোন টাকা নেই। এই একটাই নোট। তুমি এক কাজ কর পুরোটাই নিয়ে যাও।

'ছিড়া নোট নিয়া ফায়দা কি ?'

'ফায়দা আছে। গুলিস্তানে ছেড়া নোট বদলে নেয়। দু'টাকা বাটা রাখবে। কুড়ি টাকার বদলে তুমি পাবে আঠারো টাকা। দশ টাকা লাভ।'

'আমার লাভের দরকার নাই।'

'এখন আমি টাকা পাব কোথায় ? বলেছি না আমার কাছে একটাই নোট !'

'টাকা পয়সা না নিয়া রিকশাতে উঠেন ক্যান ?'

'ভুল করে উঠি। তুমি ভুল কর না ? মাঝে মাঝে বৃষ্টির দিনে প্লাস্টিকের পর্দা ছাড়া চলে আস না ?'

যুক্তি রিকশাওয়ালাকে কাবু করল না। সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। অরু বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি মিনিট দশেক অপেক্ষা কর। তোমাকে ভাল নোট দেব। রিকশার সিটে বসে আরাম করে চা খাও।

ফ্লাক্সে করে এক ছেলে ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করছে। অরু তাকে ডেকে বলল, তুমি এই রিকশাওয়ালাকে এক কাপ চা দাও। রিকশাওয়ালা খানিকটা হকচকিয়ে গেল। এই জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি সে এর আগে হয় নি।

অরু ঘড়ি দেখল - চারটা সাত।

কাটায় কাটায় চারটার সময় তার আসার কথা, সে তাই এসেছে। মুহিবের খোঁজ নেই। সে মনে হয় আজও দেরি করবে। আজকের দিনটিতেও সে কি সময় মত আসবে না ?

কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ের জন্যে একা একা অপেক্ষা করা যে কি যন্ত্রনা তা ক'জন জানে ? সেজেগুজে একা দাড়িয়ে থাকা মেয়ের দিকে সবাই খানিকটা কৌতুহল, খানিকটা করুণা এবং খানিকটা তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকায়। বুড়োরা এমন ভঙ্গি করে যেন দেশ রসাতলে যাচ্ছে। সংসদ ভবনের এই রাস্তাটা এখন বলতে গেলে বুড়োদের দখলে। সকাল বিকাল এদের দেখা যায় হাঁটাহাঁটি করছে। স্বাস্থ্য রক্ষা। যে করেই হোক আরো কিছুদিন বাঁচতে হবে। সমাজের অনাচার দেখে নাক সিঁটকাতে হবে। কিছুতেই মরা চলবে না।

রিকশাওয়ালা চা খেতে খেতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুকে দেখছে। এও এক যন্ত্রনা। একজন কেউ তাকিয়ে থাকলে কিছুতেই স্বাভাবিক হওয়া যায় না। অরু আবার ঘড়ি দেখল - মাত্র পাঁচ মিনিট পার হয়েছে। সময় কি পুরোপুরি থেমে আছে ? না ঘড়ি বন্ধ ?

মুহিবকে এতক্ষণে দেখা গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটতে ছুটতে আসছে। কোন দিকে তাকাচ্ছে না। অরু ডাকল, এ্যাই। মুহিব থমকে দাঁড়াল। যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে তাকাচ্ছে। কি যে অদ্ভূত কাণ্ডকারখানা ! রাগে অরুর গা জ্বলে যাচ্ছে। আজকের দিনে সে এমন বিশ্রী পোশাক পরে এল কি করে ? কে বলেছে তাকে পাঞ্জাবী পরতে ? কটকটে হলুদ রঙের সিল্কের পাঞ্জাবীতে তাকে যে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে তা বোধহয় সে নিজেও জানে না। আয়না দিয়ে নিশ্চয়ই নিজেকে দেখেনি। অরু গলা উচিয়ে ডাকল, এ্যাই এ্যাই।

মুহিব তাকাল। এবং হেসে ফেলল। সেই হাসি এত সুন্দর যে অরু তার দেরি করে আসার অপরাধ অর্ধেক ক্ষমা করে দিল। কটকটে হলুদ পাজ্ঞাবী পরার অপরাধ অবশ্যি এখনো ক্ষমা করা যাচ্ছে না।

'তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ভেবে রেখেছিলাম আজ অন্তত এক ঘণ্টা আগে উপস্থিত হব। গাড়ি যোগাড় করতে গিয়ে ...'

'কে তোমাকে গাড়ি যোগাড় করতে বলেছে ?'

'কেউ বলেনি। ভাবলাম ... '

'কোথায় তোমার গাড়ি ?'

'তেল নেবার জন্যে পেট্রল পাম্পে থেমেছিল - তারপরে আর স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'ঐখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ ?'

'হুঁ। খুব দূর না। আসাদ গেট পেট্রল পাম্প।'

'ভাংতি টাকা আছে তোমার কাছে ?'

'আছে।'

'দেখি আমাকে দশটা টাকা দাও। আর ঐ চাওয়ালা ছেলেটাকে এক কাপ চায়ের দাম দাও।'

অরু টাকা নিয়ে রিকশাওয়ালার দিকে এগিয়ে গেল। হাসিমুখে বলল, এই নাও দশ টাকা। আট টাকা রিকশা ভাড়া। দু'টাকা ওয়েটিং চার্জ।

তার ইচ্ছা ছিল কিছু কঠিন কথা রিকশাওয়ালাকে বলে। বলা হল না। আজ একটা শুভ দিন। আজ তাদের বিয়ে। এই দিনে কঠিন কথা বলা সম্ভব না। তার একুশ বছর জীবনের অনেক কথাই সে পরবর্তী সময়ে মনে করতে পারবে না। কিন্তু আজকের দিনের সব কথা মনে থাকবে। কি দরকার আজ ঝগড়া করার ? বরং রিকশাওয়ালার নাম জিজ্ঞেস করা যাক। এই রিকশায় করেই না হয় কাজি অফিসে যাওয়া যাবে। যে রিকশায় করে তারা বিয়ে করতে গেল সেই রিকশায়ালার নাম জানা রইল। এটা মন্দ কি ?

'তোমার নাম কি ?'

'আমারে জিগান ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম সুরুজ মিয়া।'

'সুরুজ মিয়া, আমরা খিলগাঁও কাজি অফিসে যাব। আজ আমাদের বিয়ে। তুমি কি নিয়ে যাবে আমাদের ?'

রিকশাওয়ালা হ্যাঁ না কিছুই বলছে না। মনে হচ্ছে সে গভীর সমস্যায় পড়ে গেছে। এতক্ষণ যাকে তুমি তুমি করে বলছিল এখন অরু তাকে কি মনে করে যেন আপনি বলল,

আপনি চিন্তা করে একটা ডিসিশানে আসুন। বেশি সময় নেবেন না। আমরা দেরি করতে পারব না।

অরু মুহিবের দিকে এগিয়ে গেল। মুহিব সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনছে। সে কখনো একটার বেশি কিনে না। আজ এক প্যাকেট কিনে ফেলল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, অরু, তুমি কি তোমাদের বাড়ির কাউকে বিয়ের ব্যাপরে কিছু বলেছ ?

অরু বলল, না। তবে রাত দশটা নাগাদ সবাই জেনে যাবে। একটা চিঠি লিখে খামের মুখ বন্ধ করে বড় আপার টেবিলে রেখে এসেছি। আপা বিয়েবাড়িতে গেছে। দশটা নাগাদ ফিরবে। তারপর হৈ চৈ বেধে যাবে। বাবার স্ট্রোক না হলেই হয়।

'কি লিখেছ চিঠিতে ?'

'তিন লাইনের চিঠি - আজ বিয়ে করছি তাই লেখা -'

'কিভাবে লেখা - ল্যাংগুয়েজটা কি ?'

'তিস লাইনে তো খুব কাব্যিক ল্যাংগুয়েজ হয় না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।'

'কাকে বিয়ে করছ এইসব কিছু লেখনি তো ?'

'না। শুধু লিখলাম - একটি বেকার এবং আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ যুবককে বিয়ে করছি। আমার মনে হচ্ছে না আমি কোন অপরাধ করছি। তার পরেও ক্ষমা প্রার্থনা করছি - আপা, তুমি বাবা-মা'কে শান্ত করবে এবং বুঝিয়ে বলবে।'

মুহিব শুকনো গলায় বলল, তোমার বাবা-মা'র রিএ্যকশান কি হবে ?

'কি করে বলব কি হবে ! তাদের কোন মেয়েতো এর আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে নি। এই প্রথম এবং এই শেষ। চল রওনা হওয়া যাক।'

তারা রিকশায় উঠল। মুহিব বলল, হুড তুলে দেব ?

'না।'

'খারাপ লাগছে অরু ?'

'খারাপও লাগছে না আবার ভালও লাগছে না। মনে হচ্ছে একটা ঘোরের মধ্যে আছি। জ্বর জ্বর লাগছে। দেখ তো জ্বর কি-না ?'

'না জ্বর নেই।'

অরু হাসতে হাসতে বলল, জ্বর নেই বলে হাত সরিয়ে নিলে কেন ? লজ্জা লাগছে ?

'হু, আজ কেন জানি অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি লজ্জা লাগছে। আজ মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।'

'তাকিয়ে আছে তো বটেই। তাকিয়ে আছে তোমার হলুদ পাঞ্জাবীর জন্যে। তুমি দয়া করে আজ রাতেই এই পাঞ্জাবী পুড়িয়ে ফেলবে।'

'আচ্ছা।'

অরু হালকা গলায় বলল, বিয়ের পর আমরা যাব কোথায় ?

'বাসর কোথায় হবে এই কথা জিজ্ঞেস করছ ?'

অরু অস্পষ্ট স্বরে বলল, হুঁ।

'বজলুর বাসায়।'

'বজলু কে ?'

'আমার স্কুল জীবনের বন্ধু, অতি ভাল ছেলে। গত বৎসর বিয়ে করেছে। তার বৌটা তার চেয়েও ভাল। ওরা একটা ঘর আমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে হুলস্থুল করেছে।'

'অপরিচিত কারো বাসায় উঠতে আমার ইচ্ছে করছে না।'

'ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার মনে হবে এরা অপরিচিত না। খুবই পরিচিত। তা ছাড়া আমার আর কোন জায়গাও নেই যেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'তুমি তোমার আপাকে সব খুলে বলবে বলেছিলে - বলেছ ?'

'না।'

'বলনি কেন ?'

'কাল বলব। আপাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

'উনি রাগ করবেন না ?'

'পাগল, আপার রাগ করার ক্ষমতাই নেই।'

'আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছ, একটু আগেই না একটা খেলে।'

'টেনশন বোধ করছি।'

অরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই যে তোমার পাশে বসেছি - শেষবারের মত বন্ধুর পাশে বসেছি। এরপর বসব - স্বামীর পাশে।

'স্বামী কি বন্ধু না ?'

'গল্প উপন্যাসে বন্ধু। বাস্তবে না। বাস্তবের স্বামীরা যতটা না বন্ধু তার চেয়েও বেশী অভিভাবক।'

মুহিব গম্ভীর গলায় বলল, তুমি ভুল করছ অরু। আমি তোমার বন্ধুই থাকব।

অরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, থাকলে তো ভালই।

'তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে ?'

'আছে। হুডটা তুলে দাও। আসলেই সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি তাকাচ্ছে আমাদের রিকশাওয়ালা। যেভাবে সে পেছন ফিরে ফিরে রিকশা চালাচ্ছে মনে হয় এ্যাকসিডেন্ট করবে।'

মুহিব হুড তুলে দিল। অরু বলল, আজ কত তারিখ বল তো ?

'এগারোই ডিসেম্বর।'

'বাংলা কত ?'

'জানি না বাংলা কত।'

অরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আজ আমাদের বিয়ে আর আজকের বাংলা তারিখটা তোমার জানার ইচ্ছা হল না ? আজ ২৬শে অগ্রায়ণ।

'ও আচ্ছা ২৬শে অগ্রায়ণ।'

'আর আমাদের রিকশাওয়ালার নাম হচ্ছে সুরুজ মিয়া। তার নামটাও মনে রাখা দরকার। তার রিকশায় করে বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

মুহিব কিছু বলল না। অরু বলল, ভাল করে দেখ তো জ্বর কি-না। এত খারাপ লাগছে কেন ? মাথা ঘুরছে। ভুলে জরদা দিয়ে পান খেলে যেমন লাগে তেমন লাগছে।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ধর আর আধ ঘণ্টা।'

অরু ঘড়িতে দেখল তাদের বিয়ের পুরো অনুষ্ঠান শেষ হতে মাত্র ১৬ মিনিট লাগল। কাজী সাহেবের কাছে অনুষ্ঠানটা হয়ত খুব 'বোরিং' লাগছে। তিনি কয়েকবার হাই তুললেন এবং যন্ত্রের মত বললেন, এইখানে সই করেন। তারিখ দেন। অরু গোটা গোটা করে লিখল, অরুণা

চৌধুরী। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ। কি আশ্চর্য ! কটকটে হলুদ পাঞ্জাবী গায়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা এখন তার স্বামী। এই জীবনের সবচে' কাছে মানুষ। কোন ভুল হয়নি তো ? প্রচণ্ড বড় কোন ভুল ! যে ভুল এই জীবনে আর শোধরানো যাবে না। অরুর পানির পিপাসা পেয়ে গেল। কাজী সাহেবকে সে কি বলবে পানির কথা ? না-কি মুহিবকে বলবে ? মুহিবের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা লাগছে। মুহিবের দিকে তাকাতেও লজ্জা লাগছে।

বজলু এগিয়ে এসে বলল, ভাবী, চলুন যাওয়া যাক।

ভাবী ডাকটা কি অদ্ভূত শোনাচ্ছে ! গা শির শির করে। অরু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুল। মুহিবের অন্য বন্ধুরা এখনো কেউ তাকে কিছু বলেনি। একজন শুধু তাকে বলেছে - কনগ্র্যাচুলেশনস ভাবী, বলে হাতে একটা গোলাপ ফুল দিয়েছে। ফুলটার দিকে তাকাতেও কেন জানি লজ্জা লাগছে। মুহিবকেও অন্য রকম লাগছে। ও আচ্ছা এখন বোঝা গেল - বাবু চুল কেটেছেন। নতুন হেয়ার স্টাইল।

গোলাপ ফুল দেয়া মানুষটা বলল, কোথাও বসে এক কাপ চা কিংবা কোল্ড ড্রিংস খাওয়া যাক। কাছেই একটা ভালো কনফেকশনারী দোকান আছে। যাবে ?

বজলু বলল, না না - স্ট্রেইট আমার বাসায় চল। কেক কেনা আছে। কেক কাটা হবে। রেনুকে চা রেডি রাখতে বলেছি। গাড়িতে উঠ সবাই। গাড়িতে উঠ। মুহিব তুই ভাবীকে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বস। আমরা সবাই পেছনে আছি।

অরুর প্রচণ্ড পানির পিপাসা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে এক গ্লাস পানি খেতে না পারলে সে মরে যাবে। বজলু নামের মানুষটার বাসায় তার যেতে একেবারেই ইচ্ছা করছে না। এমন কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে যেখানে একটা মানুষও নেই। খুব নির্জন কোন জায়গা, যেখানে শুধু সে এবং মুহিব থাকবে। আর কেউ থাকবে না। কেউ না।

বজলুর স্ত্রী রওশন আরাকেও অরুর পছন্দ হল না। মেয়েটা এক সেকেণ্ডের জন্যে না থেমে কথা বলে যাচ্ছে। ক্রমাগত কথা। ছোটাছুটিও করছে অকারণে। এই সামান্য সময়ে একটা গ্লাস ভেঙেছে, টেবিল ক্লথের উপর পায়েস ফেলে দিয়েছে। সামান্য চা দেয়া নিয়ে সে যে কথাগুলি বলল তা হচ্ছে -

'ও মা। এখনো চা দিলাম না। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধহয়। ঠাণ্ডা হলে ঠাণ্ডা চা খেতে হবে। আমি আবার গরম করতে পারব না। সারাক্ষণ চুলার পাশে বসে থাকলে গল্প করব কখন ? চায়ে কিন্তু চিনি দেই নাই। যার যার দরকার নিয়ে নেবেন। সরি সরি, চিনি বোধ হয় দেয়া হয়েছে। আগে চেখে দেখবেন। এখানে ডায়াবেটিসওয়ালা কেউ আছে ? থাকলে আওয়াজ দিন। আর শুনুন, চায়ের কাপে সিগারেট ফেললে ঐ চা জোর করে খাইয়ে দেব। মাই গড, চামুচ দেয়া হয়নি।'

মুহিব অরুকে বলল, একটু বারান্দায় এসো তো।

অরু বারান্দায় এসে ক্লান্ত গলায় বলল, সবাই এত কথা বলছে - আমার একেবারে মাথা ধরে গেছে।

'এরা বেশিক্ষণ থাকবে না, চলে যাবে। তুমি কি কিছুক্ষণ রেস্ট নেবে ? রেস্ট নিতে চাইলে পাশের ঘরে চলে যাও - তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে শরীর খারাপ করেছে।'

'প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আর পানির পিপাসা হচ্ছে। তিন গ্লাস পানি খেয়েছি তবু পিপাসা মিটছে না।'

'মাথা ধরা কি খুব বেশি ?'

'হুঁ।'

'দাঁড়াও, প্যারাসিটামল এনে দিচ্ছি। শোন অরু, আমাকে ঘণ্টা খানিকের জন্যে একটু বাইরে যেতে হবে।'

অরু হকচকিয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, কেন ?

'আমার দুলাভাই বলে রেখেছেন যেন ঠিক সাড়ে সাতটায় অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর কথা তো তোমাকে বলেছি - দেখা না করলে - স্ট্রেইট বলবে, বের হয়ে যাও।'

অরু দুঃখিত গলায় বলল, আজকের দিনটা তুমি আলাদা রাখতে পারলে না ? বলতে পারলে না যে তোমার কাজ আছে ?

মুহিব অস্পষ্ট স্বরে বলল, না অরু বলতে পারি নি। দুলাভাইকে এটা বলা সম্ভব না। তাছাড়া আমার ক্ষীণ সন্দেহ কি জান ? চাকরির কোন ব্যাপার। উনি হয়ত কিছু ব্যবস্থা করেছেন। ইচ্ছা করলে তো তিনি পারেন। তুমি ঘণ্টা খানিক থাক, আমি চলে আসব।

'এই বাড়িতে আমার এক সেকেণ্ডও থাকতে ইচ্ছা করছে না। তোমার বন্ধু পত্নীকে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।'

'ও কিন্তু খুব ভাল মেয়ে অরু। কথা বেশি বলে। কিন্তু মেয়ে চমৎকার। আমার একটা জেনারেল অবজারভেশন কি জান ? যারা কথা বেশি বলে তারা মানুষ ভাল হয়। যাও, তুমি ভেতরে গিয়ে বস। এক ঘণ্টার বেশি আমি এক সেকেণ্ডও দেরি করব না। অনেস্ট।'

'এক ঘণ্টার বেশি আমাকে যদি এই বাড়িতে থাকতে হয় - আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব - ঐ মহিলাটিকে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।'

কথা শেষ হবার আগেই বারান্দায় রওশন আরাকে দেখা গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, কাজ-কারবার এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ? সারা রাত তো ভাই পড়েই আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাল বাসাবাসি না করলে হয় না ?

অরুর অসহ্য বোধ হলেও সে হাসার ভঙ্গি করল। এই মহিলা কিছুক্ষণ আগে তাকে ভয়ঙ্কর গা-জ্বালা ধরানোর মত কিছু কথা বলেছেন। অরুর ইচ্ছা করছিল গলা চেপে ধরতে। রওশন আরা ভাল মানুষের মত তাকে ডেকে পাশের ঘরে নিয়ে গেছে। গায়ে হাত রেখে কথা বলা শুরু করেছে -

'এই দেখ ভাই তোমাদের বাসর ঘর। পছন্দ হয় কি না দেখ।'

অরুর পছন্দ হল। ঘরটা আসলেই সুন্দর করে সাজানো। বালিশের ওয়ার এবং বিছানার চাদর হালকা গোলাপী। গোলাপী চাদরে বেলী ফুল এবং গোলাপ দিয়ে নানা রকমের নকশা করা। খাটের পাশে সাইড টেবিলে ফুলদানি ভরতি গোলাপ। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা টেবিলে পানির জগ এবং গ্লাশ। একটা ফ্লাক্স এবং চায়ের কাপও দেখা যাচ্ছে। ঘরের চার কোণায় চারটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে।

'অরু ভাই শোন, প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছি। বাসররাতে ঘর কখনো অন্ধকার করতে নেই। এই জন্যেই প্রদীপ। প্রদীপ নেভাবে না। ভয়ের কিচ্ছু নেই, তোমরা কি করছ বা করছ না আমরা দেখতে আসব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে - ফ্লাক্সে চা আছে, টিফিন বক্সে কেক বিসকিট এবং লাড্ডু আছে। গল্প করতে করতে রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ক্ষিধে পেয়ে যাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমাদের কি হয়েছে শোন - এমন ক্ষিধে পেয়ে গেল। হি-হি- হি। পেটের ক্ষিধে কি আর চুমু খেলে মিটে ? কি ভাই ঠিক না ? তোমাদের জন্যে এই

কারণেই সব খাবার-দাবার দিয়ে দিয়েছি। সবচে' ইম্পর্টেন্ট জিনিস রেখেছি তোষকের নিচে। ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি বল তো ?

'জানি না।'

'বিয়ের রাতেই তুমি নিশ্চয়ই প্রেগনেন্ট হতে চাও না ? যাতে না হতে হয় সেই ব্যবস্থা। এটাও ভাই আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। এখন তুমি আমাকে অসভ্য ভাবছ। পরে আমাকে থ্যাংস দেবে। বুঝলে ?'

অরু কোন কথা বলেনি। কথা বলতে ইচ্ছে করেনি। মুহিব যে এক ঘণ্টা থাকবে না সেই এক ঘণ্টা তার কি করে কাটবে ভেবেই অস্থির লাগছে। তাছাড়া মাথা ধরাটা বাড়ছে। নির্ঘাৎ জ্বর এসে গেছে। বমি বমি ভাবও হচ্ছে।

মুহিব তার দুলাভাই ইস্ট এশিয়াটিক লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার শফিকুর রহমান সাহেবের ঘরের দরজা ফাঁক করে মাথা ঢুকাল।

শফিকুর রহমান বললেন, অপেক্ষা কর। আমি তোমাকে ডাকব। বলেই তিনি হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাতটা পাঁচ বাজে। মুহিবকে সাতটায় আসতে বলেছিলেন। সে পাঁচ মিনিট দেরি করে এসেছে।

শফিকুর রহমান সাহেবের এই অফিস ঘরটি বেশ জমকালো। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। বিশাল আকৃতির সেক্রেটেরিয়েট টেবিলে তিনটা টেলিফোন। একটা টেলিফোনের রঙ লাল। মনে হয় কোন মিনিস্টারের ঘর। এয়ার কুলার আছে। এই শীতেও এয়ার কুলার চালু করা। বিজ বিজ শব্দ হচ্ছে। মাথার উপর খুব আস্তে ফ্যান ঘুরছে। শফিকুর রহমান মাঝে মাঝেই রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত অফিস ঘরে থাকেন।

তিনি মানুষটা ছোটখাট তবে তাঁকে দেখলেই মনে হয় ঈশ্বর এ-জাতীয় মানুষদের একজিকিউটিভ বস বানানোর জন্যে বিশেষ করে তৈরি করেছেন। তাঁদের গলার স্বর এয়ার কুলারের হাওয়ার মতই শীতল। মেজাজও শীতল, তবে সেই শীতল মেজাজের সামনে এসে দাঁড়ালে বুকের রক্তও শীতল হয়ে যায়।

ঠিক সাতটা কুড়ি মিনিটের সময় শফিকুর রহমান বেল টিপলেন। মুহিব দরজা খুলে ঢুকল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, তোমাকে ডাকিনি, তুমি বস। যথাসময়ে ডাকব। বেয়ারাকে ডেকেছি চা দেবার জন্যে।

'একটা কাজ ছিল দুলাভাই।'

'আমিও তোমাকে কাজেই ডেকেছি। অকাজে ডাকিনি। অপেক্ষা কর।'

মুহিব ঘর থেকে বেরিয়ে ওয়েটিং রুমে বসল।

শফিকুর রহমান তাঁকে কফি দেয়ার নির্দেশ দিয়ে টেলিফোন নিয়ে বসলেন। বিদেশের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের জন্যে এই সময়টাই উত্তম। কিছু জরুরী ট্রানজেকশন টেলিফোনের মাধ্যমেই হবে। এল সি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে।

রাত আটটায় মুহিব আবার উঁকি দিল। ক্ষীণ গলায় ডাকল, দুলাভাই।

শফিকুর রহমান ফাইল দেখছিলেন। ফাইল থেকে চোখ তুললেন না। মুহিব বলল, আমার খুব জরুরী একটা কাজ ছিল।

শফিকুর রহমান শীতল গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে বলেই তোমাকে আসতে বলেছি। গসিপ করার জন্যে ডাকি নি। তারপরেও তুমি যদি মনে কর তোমার কাজ অসম্ভব জরুরী তাহলে চলে যেতে পার। তোমাকে বেঁধে রাখা হয়নি।

তিনি টেলিফোন তুলে ডায়াল করা শুরু করলেন। মুহিব ফিরে গেল আগের জায়গায়। তার মুখে থুথু জমতে শুরু করেছে, অসম্ভব রাগ লাগছে। ইচ্ছে করছে পুরো অফিসটা পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে দিতে। তার সামনেই এসট্রে তবু সে ইচ্ছে করে কার্পেটে সিগারেটের ছাই ফেলছে।

অফিস এ্যাটেণ্ডেন্ট রফিক মিয়ার অবস্থাও তার মত। সাহেব অফিসে আছেন বলে সেও যেতে পারছে না। শুকনো মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। কিছু করার নেই বলেই বোধহয় মুহিবকে এসে জিজ্ঞেস করল, এই বৎসর শীত কেমন বুঝতেছেন স্যার ? মুহিব কোন কথা বলল না যদিও তার বলতে ইচ্ছে করছে - কাছে আস রফিক মিয়া, তোমার গালে একটা চড় দেই। চড় খেলে বুঝবে শীত কত প্রকার ও কি কি ?

মুহিবের ডাক পড়ল রাত দশটায়। শফিকুর রহমান হাই তুলতে তুলতে বললেন, সরি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। তোমাকে কি কফি দেয়া হয়েছে ?

'জ্বি।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোস।'

মুহিব বসল। মনে মনে বলল, আপনাকে আমি কোন কালেই পছন্দ করি নি। ভবিষ্যতে কখনো করব, সেই সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। আপনি অতি কুৎসিত একটি প্রাণী। মাকড়শা দেখলে মানুষের যেমন গা ঘিন ঘিন করে - আপনাকে দেখলেও আমার অবিকল সেই রকম গা ঘিন ঘিন করে। এখন আপনাকে দেখাচ্ছে একটা মাকড়শার মত। মেয়ে মাকড়শা। যে পেটে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

'মুহিব।'

'জ্বি।'

'তোমাকে চিটাগাৎ যেতে হবে।'

মুহিবের গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বুক ধক ধক করতে লাগল। মনে হচ্ছে মাকড়শাটা এখন বলবে - আজ রাতেই যেতে হবে। তুর্ণা নিশীথায়।

মুহিব চাপা গলায় বলল, কখন যেতে হবে ?

'দি আর্লিয়ার, দি বেটার। ভোড়ের ট্রেনে যেতে পার। কিংবা দুপুরের দিকে যেতে পার। দুপুরে অফিসের একটা গাড়ি চিটাগাং যাবে। যেটা তুমি প্রেফার কর। তোমার জন্যে চাকরির ব্যাবস্থা করা হয়েছে। কি চাকরি বেতন কত সব চিটাগাং গেলেই জানবে। টেলিফোনে কথা বলে রেখেছি। আজ দুপুরেই কনফার্ম করা হয়েছে। ছয় সাত হাজার টাকা বেতন হবার কথা। তারচে' বেশিও হতে পারে। সবচে' যেটা ভাল সেটা হচ্ছে - কোয়ার্টার আছে। যতদূর শুনেছি ভালো কোয়ার্টার। বিদেশে ট্রেনিং-এর সুযোগ পাবে। সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অল্প সময়ে ভালো উন্নতি করবে।'

মুহিবের হৃৎপিণ্ড এমন লাফাচ্ছে যে মনে হচ্ছে গলা দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসবে। গলার ফুটো ছোট বলে বেরুতে পারছে না। এটা স্বপ্ন দৃশ্য নয়তো ? চেয়ারে বসে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দৃশ্য খুব বাস্তব হয়। দুলাভাই তার দিকে তাকিয়ে আছেন। স্বপ্ন দৃশ্য হলেও এই মানুষটাকে ধন্যবাদ সূচক কিছু বলা উচিত। মুহিব ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল,

'থ্যাংকস দুলাভাই।'

'আমাকে থ্যাংকস দেবার দরকার নেই। তুমি আমাকে পছন্দ কর না তা আমি জানি। আমিও যে তোমাকে পছন্দ করি তাও না। যাই হোক, কাজকর্ম ঠিকমত করবে। রেসপনসিবিলিটি নামক ব্যাপারটি আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে এখন তাহলে যাও।'

মানুষটাকে এখন আর মাকড়শার মত লাগছে না - বরং সুন্দর লাগছে। সুন্দর।

ঘর থেকে বেরুনোর সময় দরজায় ধাক্কা খেয়ে কপালের একটা অংশ ফুলে গেল। ব্যথা লাগছে। এটা তাহলে স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে শারিরীক ব্যথা বোধ থাকে না।

মুহিব আশঙ্কা করছিল রাত এগারটায় সে যখন উপস্থিত হবে অরু অসম্ভব রাগ করবে। কেঁদে-কেঁটে একাকার করবে। সে-রকম কিছু হল না। অরু হাসিমুখে বলল, আমি ভাবলাম তুমি পালিয়ে গেছ, প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। এসো খেতে বসি। আদর্শ বাঙালী স্ত্রীদের মত না খেয়ে বসে আছি।

মুহিব বলল, ওরা কোথায় ?

অরু হাসতে হাসতে বলল, তুমি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই তোমার অন্য বন্ধুরা চলে গেল। তারপর মজার একটা ব্যাপার হল - তোমার প্রিয় বন্ধু বজলু এবং রওশন আরা ভারী অকারণে তুমুল ঝগড়া শুরু করলেন। সে এক দেখার মত দৃশ্য। আমি হতভম্ব। এত অল্প সময়ে ঝগড়া ক্লাইমেক্সে চলে যেতে পারে তা আমার জানা ছিল না। রওশন আরা ভাবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি কি নাইলনের দঁড়ি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রেখেছি ? গো এওয়ে। তুমি চলে গেলে আমি প্রাণে বেঁচে যাই। তুমি আমার লাইফ হেল করে দিয়েছ। তারপরই ভাবী উল্কার বেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি তোমার বন্ধুকে বললাম, আপনি দেখছেন কি উনাকে আটকান।

বজলু সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, আমি আটকাব কেন ? আমার কিসের দায় ? আপদ বিদেয় হয়েছে ভাল হয়েছে। তার আধ ঘণ্টা পরই বজলু সাহেবের মাথা ঠাণ্ডা হল। উনি নরম গলায় বললেন, আমার মিসটেক হয়েছে। খুবই খারাপ লাগছে। কি করা যায় বলুন তো ? ও গেছে তার ভাইয়ের বাড়ি, নিয়ে আসি কি বলেন ? আমি কিছু বলার আগেই উনিও উল্কাল মত বেরিয়ে গেলেন। সেই থেকে আমি একা বসে আছি।

'সে কি ! আর কেউ নেই ?'

'একটা কাজের মেয়ে আছে। সে বলল, সপ্তাহে এই ঘটনা দু' থেকে তিনবার হয়। সাধারণত হয় সন্ধ্যার দিকে। বেগম-সাহেব তার ভাইয়ের বাসায় চলে যান। সাহেব যান তাঁর পিছু পিছু। রাত বারোটা-একটার দিকে ভাই গাড়ি করে দু'জনকে পৌঁছে দিয়ে যান।'

'তার মানে কি এই যে এ-বাড়িতে আমরা এখন মাত্র দু'জন ?'

'কাজের মেয়েটি আছে।'

'সে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। কোন কাজকর্ম না থাকলে এরা অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে পারে।'

'অরু হাসতে হাসতে বলল, ও ঘুমুচ্ছে। দাঁড়াও ওকে ডেকে দিচ্ছি, খাবার গরম করুক।'

'ডাকতে হবে না। খাবার যা গরম করার তুমি কর। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ডিরেকশন দেব। তোমার মাথা ধরা সেরেছে ?'

'হু। ঘর ফাঁকা হওয়া মাত্র মাথা ধরা চলে গেল।'

অরু রান্নাঘরে ঢুকল। অরুর পেছনে পেছনে গেল মুহিব। অরু থালা-বাসন, হাড়ি-কুড়ি এমনভাবে নাড়ছে যেন এই রান্নাঘর তার দীর্ঘদিনের চেনা। তার নিজেরই যেন বাড়িঘর। মুহিব বলল, একটা থালায় খাবার গরম করে দাও - রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই খেয়ে ফেলি।

অরু বলল - একসেলেন্ট আইডিয়া।

'মেনু কি ?'

'পোলাও টোলাও করে হুলস্থুল করেছেন।'

মুহিব বলল - নিজেরা বোধ হয় না খেয়ে আছে।

অরু প্লেটে খাবার বাড়তে বাড়তে বলল, বিয়ের রাতে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। শুধু জানতে চাচ্ছি কি মনে করে তুমি এত দেরি করলে ?

'ইচ্ছে করে করিনি।'

'ইচ্ছে করে যে করনি তা অনুমান করতে পারছি। তোমার দুলাভাই তোমাকে আটকে ফেলেছিলেন, এই তো ব্যাপার ? তুমি তার হাত থেকে বের হয়ে আসতে পারলে না। একটি রাতের জন্যে কি এই সাহস দেখানো যেত না ?'

মুহিব বলল, তুমি কিন্তু ঝগড়ার সুরে কথা বলা শুরু করেছে। আজ ঝগড়া করলে সারা জীবন ঝগড়া হবে। এসো আজ রাতটা হেসে হেসে পার করে দি। আমি এগারটা হাসির গল্প

রেডি করে রেখেছি। শুনবে আর হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়বে। এগারটা গল্পের মধ্যে পাঁচটা ভদ্র আর দু'টা হচ্ছে মিড নাইট স্পেশাল। রাত বারোটার পর বলা যায়।

অরু বলল, খবরদার কোন অশ্লীল গল্প চলবে না। অশ্লীল গল্প বললে আমি কিন্তু খুব রাগ করব।

'পৃথিবীর সবচে' মজার গল্পগুলি হচ্ছে অশ্লীল গল্প।'

'আমি পৃথিবীর সবচে' মজার গল্পগুলি শুনতে চাচ্ছি না। তুমি বরং কম মজার গল্পগুলি বল। এখুনি শুরু কর। তার আগে জানতে চাচ্ছি কপাল ফাটালে কি করে ?

মুহিব বলল, দুঃখে মানুষের কপাল ফাটে আমারটা ফেটেছে আনন্দে। পরে তোমাকে গুছিয়ে বলব এখন শোন স্টোরি নাম্বার ওয়ান। স্যার ক্লাসে পড়াচ্ছেন। শেরশাহ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। এক ছাত্র তাই শুনে অবাক হয়ে বলল, সে কি স্যার ! শেরশাহের আগে কি ঘোড়া ডাকতে পারত না ?

অরু হাসতে হাসতে বিষম খেল। হাসির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে কাজের মেয়েটি উঠে এসেছে। সে দুজনকে রান্নাঘরে দেখে বেশ অবাক হল। অরু বলল, এ্যাই শোন, তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে। তোমার ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়। থালা-বাসন কিচ্ছু ধুতে হবে না। আমি দরজা-টরজা খুব ভাল মত বন্ধ করে ঘুমুতে যাব।

মুহিব বলল, সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না - দ্বিতীয় গল্পটি শোন। রোগশয্যায় শায়িতা স্ত্রী কাঁদো কাঁদো গলায় স্বামীকে বলছে, আমি জানি আমি মারা গেলেই তুমি বাঁচ, তাই না ?

স্বামী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, এমন নির্মম সত্য কথা এভাবে বলতে নেই লক্ষ্মী সোনা। একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর।

অরু এই গল্পে হাসল না। বিরক্ত স্বরে বলল, মেয়েদের ছোট করা হয় যেসব গল্পে সেসব শুনতে আমার ভাল লাগে না।

'এই গল্পে কোথায় মেয়েদের ছোট করা হল ?'

'ছোট করা হয়েছে, তুমি বুঝবে না।'

'কোথায় ছোট করা হয়েছে বুঝিয়ে বল। আমি একটা সহজ রসিকতা করলাম। এখানে মেয়েদের কোথায় ছোট করা হল - ?'

অরু বলল, আলাপ আলোচনা আবার কিন্তু ঝগড়ার দিকে টার্ন নিচ্ছে।

‘আমি মজার কিছু গল্প বলার চেষ্টা করছি। তুমি যদি সেগুলি ঝগড়ায় নিয়ে যাও আমি কি করব ?‘

‘গল্প বলা বন্ধ করে চল ঘুমুতে যাই। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।‘

মুহিব বলল, আজ তো ঘুমুনোর কথা না। পৃথিবীতে এমন কোন স্বামী-স্ত্রী পাবে না যারা বাসর রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে।

অরু বলল, আমরা তাহলে হব ব্যাতিক্রম। আমরা বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ব। এক ঘুমে রাত কাবার করে দেব।

‘আমি তোমাকে এক সেকেণ্ডের জন্যেও ঘুমুতে দেব না। দরকার হলে গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেব।‘

‘দ্যাট রিমাণ্ডইস মি। শোবার ঘরে তুমি কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারবে না। ফুলের গন্ধে ঘর ম ম করছে। তুমি সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর দুর্গন্ধ করে ফেলবে তা হতে দেব না। দয়া করে সিগারেট যা খাওয়ার এই রান্নাঘরে খেয়ে যাও। আর গা থেকে পাঞ্জাবীটা খুলে দাও। আমি এখন এটা পুড়াব।‘

‘সত্যি পুড়াবে ?‘

‘হ্যাঁ সত্যি। খোল। এক্ষুণি খোল।‘

‘কি পাগলামী করছ।‘

‘কোন পাগলামী করছি না। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আমি তোমার পাঞ্জাবী পুড়াবই। এটা হবে আমাদের জীবনের একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে - বাসর রাতে কি করেছে ? আমি বলব, স্বামীর পাঞ্জাবী পুড়িয়ে ছাই বানিয়েছি।‘

যে পাঞ্জাবী পরে বিয়ে করেছি সেই পাঞ্জাবী আমি পুড়াতে দেব না। যত্ন করে তুলে রাখব। আমার ছেলে এই পাঞ্জাবী পরে বিয়ে করতে যাবে।

পাঞ্জাবী পুড়ানো হল না। তারা এক সঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকল। অরু বলল, তুমি শুয়ে পড়, আমি শাড়ি পাল্টে আসছি। সিল্কের শাড়ি পড়ে আমি ঘুমুতে পারব না। রওশন আরা ভাবীর কাছ থেকে আমি একটা সুতি শাড়ি রেখে দিয়েছি।

মুহিব বলল, শাড়ি পাল্টে আসতে চাচ্ছ আস, কিন্তু খবর্দার ঘুমের নাম মুখে আনবে না। সারা রাত জেগে থাকতে হবে।

'আচ্ছা যাও সারা রাত জেগে থাকব।'

'হাই তুলতে পারবে না, এবং বলতে পারবে না যে ঘুম পাচ্ছে।'

'আচ্ছা বাবা যাও বলব না।'

শাড়ি পাল্টে এসে অরু দেখে মুহিব ঘুমুচ্ছে। গাঢ় ঘুম। অরু তাকে জাগাল না। মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অসংখ্যবার বলল, আমি তোমাকে কতটুকু ভালবাসি তা তুমি কোন দিনও জানবে না। তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে আজ এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখি মেয়ে কেউ নেই। তার চোখে পানি এসে গেল।

ঘরের চার কোণায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। ফুলের গন্ধে বাতাস সুরভিত। শেষ রাতে আকাশে চাঁদও উঠল। প্রদীপের আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে নতুন এক ধরনের আলো তৈরি হল। অরুর খুব ইচ্ছা করছে ঘুম ভাঙ্গিয়ে মুহিবকে এই অদ্ভূত আলো দেখায়। কিন্তু বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আহা ! বেচারা ঘুমাক। অরুর জেগে থাকার কথা, সে জেগে থাকবে।

॥ ২ ॥

শফিকুর রহমান বাড়ি ফিরলেন রাত সাড়ে দশটায়।

সাড়ে দশটা হচ্ছে তাঁর বাড়ি ফেরার শেষ লিমিট। এপার্টমেন্ট হাউস। এগারোটার সময় কলাপসেবল গেট বন্ধ হয়ে যায়। যারা গভীর রাতে বাড়ি ফেরে তাদের স্ত্রীদের চাবি হাতে বসে থাকতে হয়। শফিকুর রহমান তাঁর স্ত্রী জেবাকে এই ঝামেলা পোহাতে দেন না। তিনি আরো কিছু কাজ করেন যা স্ত্রীরা পছন্দ করেন, যেমন উঁচু গলায় জেবার সঙ্গে কখনো কথা বলেন না। খাওয়া দাওয়া নিয়ে তাঁর কোন খুঁতখুতানি নেই। রান্না কেমন হল, ভাল না মন্দ তা নিয়ে কথা বলা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। রাতে শোবার আগে একটা সিগারেট খান, তাও বারান্দায়। ঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার করেন না।

শফিকুর রহমান ঘরে ঢোকা মাত্র জেবা বলল, মুহিব সেই যে সকালে বাসা থেকে বের হয়েছে এখনো ফিরে নি। খুব চিন্তা লাগছে।

তিনি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন, চিন্তা লাগার কি আছে। ওতো কচি খোকা নয়।

কোন খোঁজ না দিয়ে সারাদিন বাইরে। আমার খুব অস্থির লাগছে।

শফিকুর রহমান বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। তিনি স্ত্রীর অস্থিরতা কমাতে পারতেন, বলতে পারতেন - 'মুহিব ভালই আছে। দেখা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।' তা বললেন না। অকারণ অস্থিরতা তাঁর ভাল লাগে না। জেবার অনেক কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। তা তিনি প্রকাশ করেন না। তিনি ঝামেলা বিহীন সংসার পছন্দ করেন। অফিসে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়। সংসার ঝামেলা শূন্য হওয়া সেই জন্যেই এত দরকার। নিজের বিরাট বাড়ি ছেড়ে তিনি এপার্টমেণ্ট হাউসে উঠে এসেছেন ঝামেলা কমানোর জন্যে। ছোট্ট সংসার, ছবির মত গোছানো এপার্টমেন্ট থাকবে। কাজের লোক বা বাড়তি লোকের যন্ত্রনা থাকবে না। বাড়তি মানুষের যন্ত্রনা তাঁকে বলতে গেলে প্রায় সারা জীবন সহ্য করতে হয়েছে। মুহিব আছে তাঁর বিয়ের পর থেকেই। নিজের বাড়িতে যখন ছিলেন মুহিবের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ে নি। এখানে চোখে পড়ছে। তাঁর মেয়ে 'সারা' কে নিয়ে সে যেসব আহলাদী করে তাও তাঁর পছন্দ নয়। পরশু রাতে অফিস থেকে ফিরে দেখেন বারান্দায় মুহিব লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার সমস্ত শরীরে সাদা চাদর পেঁচানো। সারা বারান্দায় টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে কাঁপছে।

তিনি বললেন, কি ব্যাপার সারা ?

সারা বলল, মামা কুমীর সেজেছে। কি ভয়ংকর তাই না বাবা ?

একজন বয়স্ক মানুষ বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে - এই ধারণাটাই তার কাছে রুচিকর মনে হয় নি। তার উপর দশ বছরের একটা বাচ্চাকে ভয় দেখানোরও কোন মানে হয় না।

শফিকুর রহমান বাথরুম থেকে বের হয়ে সরাসরি খাবার টেবিলে চলে গেলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন. সারা খেয়েছে ?

'হ্যাঁ।'

তিনি লক্ষ্য করলেন শুধু তাঁকেই প্লেট দেওয়া হয়েছে। জেবা খেতে বসেনি। ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা। দুপুরে তিনি বাসায় খান না। রাতে একবেলা খান। সঙ্গত কারণেই আশা করেন রাতে জেবা তাঁর সঙ্গে খেতে বসবে।

জেবা বলল, কি যে দুশ্চিন্তা লাগছে। সকালে হঠাৎ আমাকে বলল, আপা আমাকে কি তুমি...

জেবা কথা শেষ করল না কারণ তার মনে হল মানুষটা কিছু শুনছে না। জেবা বলল, আর এক চামচ ভাত দেই ?

শফিকুর রহমান বললেন, আরেক চামচ ভাত লাগলে আমি নিয়ে নেব। তোমাকে দিতে হবে না।

খাওয়া শেষ করে তিনি মেয়েকে দেখতে গেলেন। মেয়েটার সঙ্গে খানিক্ষণ কথা বলতে পারলে ভাল লাগতো। কথা বলা যাবে না। সারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। দশটার পর সে এক সেকেণ্ডও জেগে থাকতে পারে না।

শফিকুর রহমান ঘরে বসে বাতি জ্বালাতেই সারা উঠে বসল। কোমল গলায় বলল, কেমন আছ বাবা ?

'ভাল আছি মা। তুমি ঘুমাও নি ?'

'উঁহু। ঘুম আসছে না।'

'দুপুরে ঘুমিয়েছিলে ?'

'না।'

মশারি তুলে শফিকুর রহমান বিছানায় বসলেন। সারা কেমন গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে আছে। মেয়েটা দেখতে তার মার মত সুন্দর হয় নি। তাঁর মত হয়েছে। চিবুক চোখ সবই তাঁর মত। গায়ের রঙও শ্যামলা। কি ক্ষতি ছিল মেয়েটা যদি তার মা'র গায়ের রঙের খানিকটা পেত।

'বাবা !'

'কি মা ?'

'তুমি এত গম্ভীর কেন ?'

আমিতো সব সময়ই গম্ভীর। তুমি গম্ভীর কেন ?

'মামার জন্যে আমার মন খারাপ। মামা আসছে না কেন ?'

'তোমার মামা একজন বয়স্ক মানুষ। সে যদি সারাদিন নাও আসে তা নিয়ে এত চিন্তার কিছু নেই। আসবে। তাছাড়া আজ রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'ও।'

'ঘুমুতে যাও মা।'

শফিকুর রহমান নিজের ঘরে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ কাগজ পড়লেন। রাতে বারোটার দিকে ঘুমুতে যাবার আগে শেষ সিগারেট খাবার জন্যে বারান্দায় এসে দেখেন জেবা বসে আছে। হাতে কলাপসেবল গেটের চাবি। ভাইয়ের জন্যে প্রতীক্ষা। এখনো সে না খেয়ে অপেক্ষা করছে। শফিকুর রহমান স্ত্রীকে কিছুই বললেন না।

জেবা একা একা বসে আছে। বারান্দায় আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। আধো আলো, আধো আঁধারে একা একা বসে থাকতে অদ্ভুত লাগে। মুহিব আজ সকালে তার কাছে চারশ টাকা চেয়েছিল। সে দিতে পারেনি। সংসারের টাকা তার কাছে থাকে না। বেচারা কোনদিন তার কাছে টাকা-পয়সা কিছু চায় নি। আজই চেয়েছিল - সে দিতে পারে নি। জেবার চোখ ভিজে উঠছে। এই ভাইটি তার বড়ই আদরের।

৷৷ ৩ ৷৷

রাগে “হাত কামড়াতে“ ইচ্ছা করছে। এই বাগধারা কার সৃষ্টি কে জানে। মুহিবের এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এরচে‘ সঠিক বাগধারা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। সত্যি সত্যি তার হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। চিটাগাং যাবার জন্যে তৈরি হয়ে সে ভোর আটটায় চলে এসেছে। কারণ তার দুলাভাই মানুষটি অফিসে আসেন কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। অফিসে এসে তিনি যেন দেখেন মুহিব উপস্থিত আছে। এই কারণেই মুহিব ছুটে এসেছে অরুর কাছ থেকে। ঠিকমত বিদায়ও নেয়া হয় নি। কেন সে চিটাগাং যাচ্ছে, কবে ফিরবে কিছুই বলা হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা সে অরুকে বাসায় একা ফেলে এসেছে। বজলু এবং তার স্ত্রী ফেরে নি। ওদের ব্যাপারটা কি সেই খোঁজও নেয়া হয়নি। চলে আসবার সময় গরম চায়ের কাপে ফু দিতে দিতে শুধু বলেছে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে দু‘দিন পরে। এই দু‘দিন আমি কোথায় যাচ্ছি কি করছি কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

অরু বলেছে, জিজ্ঞেস করব না। ফর গডস সেক এইভাবে চা খেও না। মুখ পুড়বে।

‘মুখ অলরেডি পুড়ে গেছে। উপায় নেই। সকাল আটটার আগে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। শোন অরু, আমি যদি পিরিচে ঢেলে চা-টা খাই তাহলে কি তোমার সুক্ষ্ম রুচিবোধ খুব আহত হবে ?‘

‘হবে। তবে আজকের জন্যে অনুমতি দেয়া গেল। পিরিচে ঢেলেই খাও।‘

মুহিব পিরিচে চা ঢালতে ঢালতে বলল, কাল রাতের ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত।

‘কোন ব্যাপার ?‘

‘এত প্ল্যান প্রোগ্রাম করেও শেষটায় শুয়ে লম্বা ঘুম। বুঝলে অরু এত আরামের ঘুম আমি কোনদিন ঘুমাইনি। সরি, ভুল বললাম। আরেকবার ঘুমিয়েছিলাম। এস. এস. সি. পরীক্ষার রেজাল্টের পর। অংক খুব খারাপ হয়েছিল। ধরেই নিয়েছিলাম পাশ করব না। রেজাল্ট হবার পর দেখি সেকেণ্ড ডিভিশন। এমন ঘুম দিলাম। ঘুম ভেঙ্গেছে পরদিন সকাল দশটায়। আনন্দে এবং দুঃখে মানুষের না-কি ঘুম হয় না। আমার মেকানিজম সম্পূর্ণ উল্টো। আনন্দ এবং দুঃখ এই দুই ব্যাপারেই আমার ঘুম বেড়ে যায়। বাবার মৃত্যুর কথা কি তোমাকে বলেছি ? বাবার শ্বাস কষ্ট শুরু হবার পর বাবাকে হাসপাতালে নেয়া হল। ভয়াবহ অবস্থা। সবাই ছোটাছুটি করছে।

মৃত্যুর আগে আগে বাবা কি মনে করে জানি আমাকে দেখতে চাইলেন। কান্নাকাটি ... হুলস্থুল। আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ আবিষ্কার করা হল - আমি হাসপাতালের বারান্দার বেঞ্চিতে শুয়ে মরার মত ঘুমুচ্ছি।

অরু বলল, ঘুমের মধ্যে তোমার কি কথা বলার অভ্যাস আছে ?

'আছে। কথা বলার অভ্যাস আছে, নাক ডাকার অভ্যাস আছে, বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবার অভ্যাস আছে। আরেকটা অভ্যাস খুব ছোটবেলায় ছিল - তোমার সুক্ষ্ম রুচির কারণে বলতে পারছি না। অভয় দিলে বলি ...'

'বলার দরকার নেই।'

'বুঝতে পারছ বোধ হয় জল ঘটিত ব্যাপার।'

'আহ্ চুপ কর তো। সাতটা একুশ বাজে।'

'কি সর্বনাশ !'

'এরকম ছটফট করবে না তো। চুপ করে বস। জলে ভেসে যাক তোমার এপয়েন্টমেন্ট। আই ডোণ্ট কেয়ার।'

'আচ্ছা যাও বসলাম।'

'এখন বল আমাকে বিয়ে করে তুমি কি সুখী হয়েছ ?'

মুহিব হাসতে হাসতে বলল, বিয়ে যে করেছি তাই বুঝতে পারছি না। এখনো তোমাকে প্রেমিকার মত লাগছে। স্ত্রীর মত লাগছে না।

'কি করলে স্ত্রীর মত লাগবে ?"

'একটু ঝগড়া করতো।'

মুহিব হাসছে। শব্দ করে হাসছে। অরুর মনে হল - এক সুন্দর করে একটা মানুষ কি ভাবে হাসে ?

খুব যেদিন তাড়া থাকে সেদিন বেবিটেক্সি পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায় সেই বেবিটেক্সির স্টার্ট কিছুক্ষণ পর পর বন্ধ হয়ে যায় এবং সেদিন রাস্তায় সবচে' বেশি জাম থাকে।

মুহিবের বেলায় কোনটাই ঘটল না। সে কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় অফিসে উপস্থিত হল। সে বেবিটেক্সি থেকে নামার কিছুক্ষণ পরে এলেন শফিকুর রহমান। মুহিবকে যথা সময়ে

উপস্থিত দেখে তিনি আননিন্দত হলেন কি-না বোঝা গেল না। শুকনো মুখে বললেন, আমার পি.এ-কে চিঠি টাইপ করতে দিয়েছি। ওর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাও।

'জ্বি আচ্ছা।'

'একটা পিক-আপ যাবে চিটাগাং। ড্রাইভার এলেই রওনা হয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কাল রাতে কোথায় ছিলে ? বাসায় ফেরনি কেন ? তোমার আপা দুশ্চিন্তা করছিল। যেদিন বাসায় ফিরবে না বলে আসবে।'

মুহিব তৃতীয়বারের মত বলল, জ্বি আচ্ছা।

'তাকে একটা টেলিফোন করে জানাও যে তুমি ভাল আছ এবং চিটাগাং যাচ্ছ। কি কারণে যাচ্ছ তাও জানাতে পার। সে খুশী হবে।'

মুহিব বাসায় টেলিফোন করল না। সবাই খানিকটা দুশ্চিন্তা ভোগ করুক। চাকরি হবার পর সে দেখা করবে। আপাকে সালাম করে বলবে - আপা তুমি হচ্ছ এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তোমার মত ভাল মেয়ে এই পৃথিবীতে আগে জন্মায়নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

এই কথাগুলি আপাকে অনেকবার বলতে ইচ্ছা হয়েছে - কখনো বলা হয়নি। এই ধরণের নাটুকে কথা বলা মুশকিল। তাছাড়া নাটুকে কথা শুনে আপা হেসে ফেলে বলতে পারে - এক চড় খাবি।

পিক-আপের ড্রাইভার সকাল দশটায় এসে উপস্থিত হল। বিরস মুখে বলল, গাড়ির ব্রেকে গণ্ডগোল আছে। ব্রেক ঠিক না করে গাড়ি বের করা যাবে না।

মুহিব বলল, ব্রেক সারাতে কতক্ষণ লাগবে ?

'এই ধরেন এক ঘণ্টা। ওয়ার্কশপে না নিলে বুঝব না।'

সে যদি বলত ঘণ্টা দুই লাগবে তাহলে বজলুর বাসা থেকে ঘুরে আসা যেত। অরু নিশ্চয়ই এখনো যায় নি। মুহিব বলল, আমরা তাহলে এগারোটার দিকে রওনা হচ্ছি ?

'জ্বি।'

এক ঘণ্টা সময় কাটানোই সমস্যা। আপাকে একটা টেলিফোন করলে অবশ্যি অনেকটা সময় কাটবে। আপা আধা ঘণ্টার আগে টেলিফোন ছাড়বে না। মুহিব শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্যেই টেলিফোন করল।

‘আপা ?‘

জেবা টেলিফোনেই প্রচণ্ড ধমক দিল - কাল রাতে তুই কোথায় ছিলি ? নিচে কলাপসিবল গেট আটকে দেয়, আমি রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চাবি হাতে বসা...‘

‘একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।‘

‘কিসের তোর এত রাজকার্য ? তোর কাজতো একটাই - টো টো করে শহরে ঘোরা। কাল রাতে না এসে ভালো করেছিস। এলে শক্ত করে গালে চড় বসিয়ে দিতাম। কোথায় রাত কাটিয়েছিস ?‘

‘আমার এক ফ্রেণ্ডের বাসায়।‘

‘একটা টেলিফোন কি সেখান থেকে করা যেতো না ?‘

‘গরীব ফ্রেণ্ড আপা, ওর টেলিফোন নেই।‘

‘ওর নেই, অন্যদের তো আছে। যে কোন দোকানে গিয়ে দু‘টা টাকা দিলে টেলিফোন করতে দেয়।‘

‘একটা ফার্মেসী থেকে টেলিফোন করেছিলাম আপা। লাইন ছিল এনগেজড।‘

‘খবর্দার মিথ্যা বলবি না। তুই মিথ্যা কথা বললে আমি টের পাই।‘

‘আচ্ছা আপা যাও আর মিথ্যা বলব না। সত্যি কথাই বলছি - কাল বিয়ে করেছি আপা। মেয়ের নাম অরু। হ্যালো আপা, শুনতে পাচ্ছ ? হ্যালো ?‘

অনেকক্ষণ পর জেবা বলল, তোর কথার ধরণে মনে হচ্ছে সত্যি বিয়ে করেছিস। আসলেই করেছিস ?

‘হুঁ।‘

‘আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।‘

‘তোমার গায়ে হাত দেব কি করে ? তুমি পাঁচ মাইল দূরে বসে আছ।‘

‘বিয়ে তাহলে সত্যি করেছিস ?‘

‘হুঁ।‘

‘কোর্টে ?‘

কোর্টে না - কাজীর অফিসে।‘

‘আমাকে বললে কি আমি ব্যাবস্থা করে দিতাম না ?‘

‘অবশ্যই দিতে, তবে দুলাভাই তাতে রাগ করতেন। আমি তাঁকে রাগাতে চাইনি।‘

‘আর আমি যে রাগ করলাম সেটা কিছু না ?‘

‘আমার উপর তুমি রাগ করতে পারবে না। তোমার পক্ষে তা সম্ভব না।‘

‘সম্ভব না কেন ?‘

‘কারণ এই পৃথিবীতে যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে তুমি তাদের সবার উপরে।‘

‘আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছিস ?‘

‘তা করছি তবে সেই সঙ্গে সত্যি কথা বলছি।‘

‘আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তুই বিয়ে করেছিস।‘

‘আমার নিজেরো বিশ্বাস হচ্ছে না।‘

‘মেয়েটা দেখতে কেমন ?‘

‘মোটামুটি।‘

‘মোটামুটি মানে ?‘

‘মোটামুটি মানে অসম্ভব সুন্দর।‘

‘কালো না ফর্সা ?‘

‘মুখটা খুব ফর্সা কিন্তু হাত দুটি সেই তুলনায় কাল। হাতে মনে হয় ক্রিম ট্রিম ঘসে না।‘

‘হাইট কত ?‘

‘কে জানে কত !‘

‘পাশাপাশি যখন দাঁড়াস তখন সে-কি তোর কান পর্যন্ত আসে ?‘

‘আসে বোধহয়।‘

‘তাহলে পাঁচ ফুট তিন। ওজন কত ?‘

‘আরে কি মুশকিল। আমি কি তাকে দাড়িপাল্লা দিয়ে মেপেছি ?‘

‘মেয়েটা আছে কোথায় এখন ?‘

‘কেন ?‘

‘আমি দেখা করব। বাসায় নিয়ে আসব।‘

‘অসম্ভব আপা। মেয়ে গোপনে আমাকে বিয়ে করেছে। এটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে জানাজানি হয়েছে। ওদের বাড়িতে এখন কেয়ামত হচ্ছে।‘

‘হোক কেয়ামত। তুই ঠিকানা বল।‘

‘ঠিকানা বলতে পারব না আপা। টেলিফোন নাম্বার দিতে পারি। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ছি, ওকে সামলে নিতে সুযোগ দাও। আজ টেলিফোন করবে না।‘

‘বেশ করব না। তুই বাসায় চলে আয়।‘

‘না আমি এখন বিদেয় হচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবে পরশু। রাখি আপা।‘

‘রাখি মানে ? টেলিফোন নাম্বার দে।‘

মুহিব টেলিফোন নাম্বার দিল। জেবা বলল, মেয়েটার মুখ লম্বা না গোল ?‘

মুহিব বিরক্ত হয়ে বলল, মুখ লম্বা না গোল তা দিয়ে কি হবে ?

‘দরকার আছে। গোল মুখের মেয়েরা ভাগ্যবতী হয়।‘

‘তোমার মুখ তো গোল। তুমি কি ভাগ্যবতী ?

জেবা খানিক্ষণ চুপ থেকে বলল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গোল মুখের মেয়েরা ভাগ্যবতী হয়। মাঝে মাঝে একসেপশন হয়। যখন একসেপশন হয় তখনকার অবস্থা ভয়াবহ ...

‘আপা, আমি আর কথা বলতে পারব না। ড্রাইভার এসে গেছে। আমরা এক্ষুণি রওনা হব।‘

‘মেয়েটার গালে কি তিল আছে ? ডান গালে ?‘

‘বড় যন্ত্রনা করছ তুমি আপা।‘

‘যন্ত্রনা করছি কেন জানিস ? আমি একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম তোর বিয়ে হয়েছে গোল মুখের একটা মেয়ের সঙ্গে। সেই মেয়েটার ডানদিকের গালে তিল।‘

‘অরুর ডানদিকের গালে তিল আছে।‘

‘সত্যি বলছিস ?‘

‘হ্যাঁ সত্যি। আপা আমি এখন যাই। ড্রাইভার ব্যাটা দুলাভাইয়ের মত কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে।‘

জেবা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

মুহিব ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা এখন রওনা হব না-কি ভাই ?

ড্রাইভার বলল, না।

‘না কেন ?‘

‘খাওয়া-দাওয়া করে স্টার্ট করব। চিন্তার কিছু নাই। উড়াইয়া নিয়া যাব।‘

‘ভাই আপনার নাম কি ?‘

‘মহসিন।‘

‘মহসিন সাহেব, উড়ায়ে নেয়ার দরকার নেই। ধীরে সুস্থে যাবেন।‘

‘যে-রকম বলবেন সে-রকম যাব। আপনারে একটা কথা বলি ভাই সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন।‘

‘না কিছু মনে করব না, বলে ফেলুন।‘

‘আমার কয়েকজন আত্মীয় যাবে চিটাগাং। যদি অনুমতি দেন এরারে গাড়ির পিছনের সিটে বসায়ে নিয়ে যাই।‘

‘আমার দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই। শুধু সত্যি কথাটা বলুন এরা আপনার আত্মীয় না-কি ভাড়ার বিনিময়ে কিছু প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছেন ?‘

মহসিন উত্তর দিল না। হাই তুলল। মুহিব বলল, প্যাসেঞ্জার কোথা থেকে তুলবেন ?

‘সায়েদাবাদ। বাস স্টেশনের কাছে।‘

‘গাড়ি ভর্তি করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে নিন, শুধু লক্ষ্য রাখবেন আমার বসার জন্য যেন জায়গা থাকে। গাড়িতে উঠেই ঘুম দেব। সারারাত ঘুমাইনি। ঘুমাতে ঘুমাতে এবং স্বপ্ন দেখতে দেখতে যাব।

ড্রাইভার হেসে ফেলল।

গাড়ি রওনা হল দুপুর একটায়। মুহিব বসেছে ড্রাইভারের পাশের সীটে। সীটটা ঢালু, বসে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ি ভর্তি মানুষ। দুটি পরিবার মালামাল নিয়ে উঠেছে। হৈ চৈ, চেচামেচি হচ্ছে। সবার জায়গাও হচ্ছে না। ছ‘সাত বছরের একটা বালিকা ক্রমাগত বলছে, সামনে বসব, সামনে বসব। বাধ্য হয়ে মুহিবকে বলতে হল, আস সামনে আস। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে মুহিবকে বসতে হয়েছে। মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে বসেছে। কথাবার্তা এমনভাবে বলছে যেন মুহিব দীর্ঘদিনের পরিচিত।

‘কি নাম তোমার খুকী ?‘

'আমার নাম লীনা। আমি ক্লাশ টুতে পড়ি।'

'বাহ্।'

'আমরা এই রকম একটা গাড়ি কিনব।'

'এত বড় গাড়ি কিনবে ?'

'এরচেয়েও বড় কিনব। লাল রঙ-এর।'

'খুব ভাল।'

'আব্বু কিনে দিবে। আব্বুর অনেক টাকা আছে।'

পেছনের সিটে বসা লীনার আব্বু বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, চুপ কর লীনা। বেশি কথা বলে। আব্বু টাকার গাছ পুতেছে।

লীনা সাময়িকভাবে চুপ করল। লীনার বাবা মুহিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার একটা সিগারেট খাবেন ? বেনসন আছে।

মুহিব বলল, এখন ইচ্ছা করছে না।

'যখন ইচ্ছা করে আমাকে বলবেন। লম্বা জার্নি, সিগারেট ছাড়া হয় না। আমি দশটা বেনসন কিনেছি হা-হা-হা। আর স্যার মেয়ে যদি বেশি বিরক্ত করে চড় দিবেন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বিচ্ছু মেয়ে। সাথে নিয়ে বের হই না। বাধ্য হয়ে ঢাকায় গিয়েছিলাম। আমার ছোট শ্যালকের বিবাহ ছিল। পরিবার নিয়ে যেতে হল। তিন হাজার টাকা গচ্চা। হাত একেবারে খালি। স্যারের গাড়ি পাওয়ায় রক্ষা হয়েছে।'

মুহিব লক্ষ্য করল লীনার বাবারও কথা বলার রোগ আছে। মেয়ে সম্ভবত বাবার কাছ থেকেই কথা বলার বিদ্যা আয়ত্ব করেছে।

'আমার শ্যালক ব্যাংকে কাজ করে। আরব বাংলাদেশ ব্যাংক।'

'তাই না-কি ?'

'জ্বি স্যার। আর মেয়ের বাড়ি মেহেরপুর। অবশ্যি এখন তারা ঢাকায় সেটলড্। মেয়ে আপনার এম.এ. পাশ।'

'খুবই ভাল।'

'লীনা ঘুমিয়ে পড়েছে না-কি একটু দেখেন তো স্যার। ঘুমিয়ে পড়লে মুখের লালায় সার্ট ভিজিয়ে দেবে। একটু কেয়ারফুল থাকবেন স্যার।'

গাড়ি প্রায় উড়ে চলছে। মহসিন একের পর এক গাড়ি ওভারটেক করছে। এখন পাল্লাপাল্লি চলছে একটা ট্রাকের সঙ্গে। ট্রাক কিছুতেই সাইড দিচ্ছে না। ট্রাকের পেছনে লেখা ‘মায়ের দোয়া‘।

॥ ৪ ॥

অরুদের বাড়ির নাম রূপ নিলয়।

দশ কাঠা জায়গা নিয়ে বেশ বড় বাড়ি। সামনে বাগান আছে। উল্লাসিত হবার মত বাগান না বরং বিরক্ত হবার মত বাগান। যে-কেউ এই বাগান দেখে ভুরু কুঁচকে বলবে এত সুন্দর জায়গাটাকে গর্ত-টর্ত খুঁড়ে এসব কি করেছে ? আপাতদৃষ্টিতে যেগুলিকে গর্ত বলে মনে হচ্ছে তার কোনটাই গর্ত নয় - জলাধার। অরুর বাবা জামিল সাহেব এইসব জলাধারের পরিকল্পনা করেছেন, যেখানে ফুটে থাকবে জলপদ্ম। একেকটা জলাধার ঘিরে থাকবে মিনি ফুল বাগান। বাড়ি ঢেকে রাখবে নীল পাতার বাগান বিলাসে। বিশেষ ধরনের আকাশী নীল রঙের বাগান বিলাসের চারা আনানো হল শ্রীলংকা থেকে। চার বছরের মাথায় পাতা বেরুলে দেখা গেল পাতার রঙ নীল নয় গোলাপী। জামিল সাহেব মালীকে ডেকে বললেন, গাছ তিনটা কেটে ফেল। অরু বলল, সে কি বাবা ! এত বড় গাছ কেটে ফেলবে ?

জামিল সাহেব ভারী গলায় বললেন, অবশ্যই কাটব। এ-জাতীয় গাছে বাংলাদেশ ভর্তি। নীল পাতা চেয়েছিলাম - এগুলি কি নীল ?

'এখন নীল না, পরে হয়ত নীল হবে।'

জামিল সাহেব আগের চেয়েও ভারী গলায় বললেন, হয়ত শব্দটা আমি অপছন্দ করি। হয়ত বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। ইয়েস অথবা নো। তুমি যদি বল এই গাছের পাতা অবশ্যই নীল হবে, আমি মালীকে কাটতে নিষেধ করব।

অরু চুপ করে গেল। তিনটা গাছই কেটে ফেলা হল।

জলপদ্মের বেলাতেও এই ব্যাপার। জলাধারে জলপদ্ম ফুটল না। বিষেষজ্ঞ হার্টিকালচারিস্ট বললেন, পানির গভীরতা কম বলেই পদ্ম ফুটছে না। আরো দু'ফুট গভীর করে দিন। তাহলেই হবে।

জামিল সাহেব জলাধার আরো দু'ফুট গভীর করলেন। পদ্ম ফুটল না। হার্টিকালচারারিস্টকে আবার ডেকে আনা হল। তিনি বললেন, বেশি গভীর হয়ে গেছে।

'বেশী গভীর হয়েছে ?'

'জ্বি, অবশ্যই বেশি হয়েছে।'

'জলপদ্মের বিষয়ে আপনি জানেন তো ?'

'জানব না মানে ? কি বলছেন আপনি !'

'আমার ধারণা আপনি একজন মহামূর্খ। জলপদ্ম কেন কোন পদ্ম সম্পর্কেই আপনি কিছু জানেন না। যেহেতু এটা মূর্খের দেশ সেহেতু করে খাচ্ছেন। আপনি দয়া করে বিদেয় হোন।'

জলপদ্ম প্রোজেক্ট বাতিল হয়ে গেল। জলাধারের চারপাশে মিনি বাগানের প্রোজেক্টও বাতিল। জামিল সাহেব এখন পুরো বাগান নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করছেন। চিন্তা-ভাবনা শেষ হয়নি বলে বাগান শুরু হয়নি। যেহেতু মালী একজন আছে - নিয়মিত বেতন নিচ্ছে, সেহেতু সে এলোমেলোভাবে কিছু গাছ লাগিয়েছে। বেশির ভাগই গোলাপ। গোলাপ জামিল সাহেবের অপছন্দের ফুল। কিন্তু তাঁর ছোট মেয়ে গোলাপ-পাগল বলে তিনি গাছগুলি এখন পর্যন্ত সহ্য করে যাচ্ছেন।

জামিল সাহেবের বয়স পঁয়ষট্টি। স্বাস্থ্য শুধু যে ভাল তা না অতিরিক্ত রকমের ভাল। দারোগা হয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন, ডিআইজি হয়ে রিটায়ার করেছেন। সারদা পুলিশ একাডেমীতে ট্রেনিং নিতে যাবার আগের দিন তাঁর বাবা নবীগঞ্জ হাই স্কুলের এ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার মুত্তালেব সাহেব তাঁকে নিয়ে বাড়ির পেছনে চলে গেলেন। সেখানে জামিল সাহেবের মায়ের কবর।

মুত্তালেব সাহেব বললেন, তুমি তোমার মায়ের কবর ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা কর যে চাকরি জীবন সৎপথে কাটাবে। এমন চাকরিতে ঢুকেছ যেখানে সৎ থাকা খুবই কঠিন। প্রতীজ্ঞা কর।

জামিল সাহেব বললেন, প্রতীজ্ঞা করার প্রয়োজন নেই।

'জানি প্রয়োজন নেই। তবু কর।'

তিনি প্রতীজ্ঞা করলেন। এই প্রতীজ্ঞা রিটায়ার করার দিন পর্যন্ত বহাল রেখেছেন। বেতনের প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করেছেন। রিটায়ার করার পর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে বাড়ি করলেন। দোতালা করার ইচ্ছা ছিল। একতলা করতেই সব শেষ হয়ে গেল। ভাগ্যিস সস্তার সময়ে দশ কাঠা জায়গা কেনা ছিল।

জামিল সাহেবের আর্থিক অবস্থা এখন মোটেই সুবিধার না। সঞ্চয় কিছু নেই। পেনশনের অর্ধেক বিক্রি করে দিয়েছেন বলে প্রতিমাসে যা পান তার পরিমান নগণ্য। জামিল সাহেবের স্ত্রী রাহেলা একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই টাকাটা সংসারে লাগে।

মোটামুটি অভিজাত এলাকায় একটি চমৎকার বাড়ি। বাড়ির সামনের বাগান এবং চব্বিশ ঘণ্টার একজন মালী দেখে এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে। বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। পরিবারটির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। জামিল সাহেবের ছোট মেয়ে অরুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। সেই বিয়ে কিভবে দেয়া যাবে তা জামিল সাহেব ভেবে পাচ্ছেন না। তাঁর মেজাজ খুব খারাপ যাচ্ছে। তাঁর ভয়ংকর মেজাজে বাড়ির সবাই আতংকগ্রস্ত। কারণ মানুষটির এর আগে দু'বার স্ট্রোক হয়েছে। তৃতীয়বারের ধাক্কা সইতে না পারারই কথা।

অরু রিকশা থেকে খুব ভয়ে ভয়ে নামল।

বাসায় কি হচ্ছে কে জানে। ভয়ংকর কিছু নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিংবা হয়ে গেছে। বাবা খুব সম্ভব হাসপাতালে। মীরু তার ছোট বোনের গোপনে বিয়ে করার খবর বাবাকে দেবে আর তিনি স্বাভাবিক থাকবেন এই আশা দুরাশা মাত্র।

বাড়িতে কাল রাতে কি ঘটেছে তা অরু খুব ভাল কল্পনা করতে পারছে। আপা বিয়েবাড়ি থেকে ফিরল রাত ন'টায়। মা'র সঙ্গে গল্প-টল্প করে রাত দশটায় ঘুমুতে গেল। তখন তার হাতে চিঠি পড়ল। চিঠি পড়ার পর খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকার পর সে একটা বিকট চিৎকার দিল। মা ছুটে এসে বললেন, কি হয়েছে ? সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কিছু না মা - ঘুমাও। মা বললেন, হাতে কার চিঠি ?

মা চিঠি পড়লেন। বাবা পড়লেন। বাবার স্ট্রোক হল। তাঁকে নিয়ে দুপুর রাতে সবাই গেল হাসপাতালে। এখনো সবাই হাসপাতালে, কেউ ফিরেনি। এই কারণেই বাড়ি খালি। মালী মতি ভাইকেও দেখা যাচ্ছে না। সকালবেলা খুড়পি হাতে মতি ভাই সব সময়ই বাগানে থাকে। আজ কেন থাকবে না ?

অরু গেট খুলে বাগানে ঢুকল। মতি ভাইকে দেখা যাচ্ছে। ঝাঝড়ি করে পানি নিয়ে আসছে। অরু ভয়ে ভয়ে বলল, মতি ভাই বাসার খবর সব ভাল ?

মতি বলল, হ।

তার মানে সে কিছুই জানে না। মতিকে কিছু জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। বাগান ছাড়া সে অন্য কিছু জানে না। জানার আগ্রহও নেই। এ-বাড়ির একটা মানুষ মরে গেলে সে যতটা কষ্ট পাবে তারচে' অনেক বেশি কষ্ট পাবে একটা গোলাপ গাছ মরো গেলে।

'মতি ভাই বাসায় কি কেউ নেই ?'

'আছে। খালি আম্মা গেছে কলেজে।'

'বাবা আছেন ?'

'হ।'

তার মানে কি ? চিঠি পড়েও বাবা নিজেকে সামলে নিয়েছেন ? অপেক্ষা করছেন তার জন্যে ? বিশ্রী অবস্থাটা এড়াবার জন্যে মা চলে গেছেন বাইরে ?

অরু কলিং বেল টিপল। আজ কলিং বেলটাও যেন অন্য রকম করে বাজছে। কান্নার মত শব্দ হচ্ছে।

দরজা খুললেন জামিল সাহেব। তাঁর হাতে খবরের কাগজ। তিনি মেয়েকে কিছু না বলে আগের জায়গায় ফিরে গেলেন। অরু ভয়ে ভয়ে বলল, কেমন আছ বাবা ?

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, যেমন সব সময় থাকি তেমন আছি। ভাল থাকার মত কিছু ঘটেনি, আবার খারাপ থাকার মত কিছু ঘটে নি। আজকের কাগজ পড়েছিস ?

'না বাবা।'

'মন দিয়ে পড়।'

'কি আছে কাগজে ?'

'কি আছে সেটা জানার জন্যেই তো পড়তে বলছি। নে কাগজটা হাতে করে নিয়ে যা।'

কাগজ হাতে অরু বাড়ির ভেতর ঢুকল। বোঝাই যাচ্ছে বাবা এখনো কিছুই জানেন না। আপা তাকে বলেনি। বুদ্ধিমতীর মত চেপে গেছে। মীরু বারান্দায় মোড়ায় বসে ছেলেকে ডিমপোচ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার ফল হয়েছে ভয়াবহ। সারা মুখে, গায়ে, মেঝেতে ডিমের ছড়াছড়ি। মীরু বলল, তুই না বললি দুপুরের দিকে আসবি, এখন চলে এলি যে ?

'ভাল লাগছিল না। আপা তুমি কি চিঠিটা পড়েছ ?'

'কোন চিঠি ?'

'তোমার টেবিলের উপর একটা চিঠি ছিল না ?'

'ছিল না-কি ? কই দেখিনি তো। কার চিঠি ?'

জবাব না দিয়ে অরু মীরুর ঘরে ঢুকে গেল। চিঠি সরিয়ে ফেলতে হবে। দু'এক দিন পরে জানালেও কোন ক্ষতি নেই। ঘুমে তার শরীর ভেঙ্গে আসছে। অরু ঠিক করল গরম পানি দিয়ে

সে দীর্ঘ একটা শাওয়ার নেবে। তারপর পর পর দু'কাপ চা খেয়ে টানা ঘুম দেবে। তার আগে অবশ্যি খবরের কাগজটা পড়ে ফেলা দরকার। বাবা জেরা করবেন।

'কলম্বোয় একদিনের সার্ক শীর্ষ বৈঠক।'

'বাকেরগঞ্জ ৫ আসনে আজ ভোট। ত্রিমুখী লড়াই।'

'সোভিয়েত ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি ইয়েলৎসিনের দখলে।'

'৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করুন ঃ স্কপ নেতৃবৃন্দ।'

'বগি লাইনচ্যুত। সাতজন যাত্রী আহত।'

হেডিং পড়ার পর আর কিছু পড়তে ইচ্ছা করে না। হেডিং পড়তে গেলেই হাই ওঠে, খবর পড়বে কি।

অরু ময়নার মাকে গরম পানি করতে বলে আবার বারান্দায় এল। আপা ডিম খাওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন আরেকটা ডিম পোচ দেখা যাচ্ছে। আবীরের মুখের সামনে চামচ ধরে মীরু বলছে - একটু হা কর বাবু। একটু হা কর। আম্মু তোমার লাল টুক টুক ছোট্ট জিভটা দেখতে চায়। আমার বাবুর মত সুন্দর জিভ এই পৃথিবীতে আর কারোরই নেই।

অরু বলল, কেন যন্ত্রনা করছ আপা ? ছেড়ে দাও না।

'নিজের চোখে দেখছিস না স্বাস্থ্যের হাল, তারপরেও বলছিস ছেড়ে দিতে ?'

'জোর করে খাওয়াবে, তারপর বমি করে সবটা ফেলে দিবে।'

'ফেলুক। তোর বাচ্চাকে তুই তোর থিওরী মত মানুষ করিস।'

'খেতে চাচ্ছে না তবু তুমি জোর করে খাওয়াবে। তোমাকে কেউ জোর করে খাওয়ালে ভাল লাগত ?'

'তুই আমার সামনে থেকে যা তো।'

চিঠির ব্যাপারটা মীরু উল্লেখ করল না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বানিয়ে বানিয়ে এক গাদা কথা বলতে হত। অল্প কথায় মিথ্যা বলা যায় না। সামান্য মিথ্যাও অনেক ফেনিয়ে ফানিয়ে বলতে হয়।

মীরু বলল - কাল বিয়ে বাড়িতে দারুন মজার একটা ব্যাপার হয়েছে - আমি হাসতে হাসতে ...

'কি হয়েছে ?'

মীরু 'কি হয়েছে' তা বলা বন্ধ রেখে বাবুকে ডিম খাওয়ানোয় ব্যস্ত হয়ে গেল। খাও লক্ষ্মীসোনা, খাও। হা কর। দেখি আমার বাবুর লাল টুকটুকে জিভটা ?

অরু বলল, কাল বিয়ে বাড়িতে কি হয়েছিল ? ওমাগো কি সুন্দর আমার বাবুর।

'দেখছিস না বাবুকে খাওয়াচ্ছি, কেন বিরক্ত করছিস ?'

'আচ্ছা আচ্ছা আর বিরক্ত করব না।'

'তুই বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আয় তো আমার কাছে চা চেয়েছিলেন, আমি বাবুর খাওয়া নিয়ে আটকা পড়ে গেলাম।'

'ছাড়া পাবে কখন ?'

'কি জানি কখন। এতো হা করছে না।'

'ঠাশ করে একটা চড় দাও। চড় খেলে হা করবে। তখন মুখে ডিম ঢুকিয়ে আরেকটা চড় দাও। ভয় পেয়ে ডিম গিলে ফেলবে।'

মীরু কঠিন চোখে তাকাল। অরু চলে গেল রান্নাঘরে বাবার জন্যে চা বানাতে। ময়নার মা চা বানানোর কাজটা ভালই পারে কিন্তু তার চা বাবা মুখে দেবেন না। তার রান্নাকরা খাবার খেতে কোন অসুবিধা নেই, শুধু চা খাওয়া যাবে না।

অরু বাবার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, বাবা চা। জামিল সাহেব চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে আছেন। তিনি চোখ খুললেন না। চোখ বন্ধ রেখেই বললেন - বোস মীরু।

'মীরু না বাবা, আমি অরু।'

'তোকে তো চা বানাতে বলিনি। মীরুকে বলেছিলাম। দায়িত্ব ট্রান্সফার করে দেবার যে বদঅভ্যাস মীরুর হয়েছে তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। তাকে যখন যা করতে বলি তখনি সে তা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এক সেকেণ্ড দেরি করে না। কাল তাকে বললাম সার্ট ইস্ত্রি করে দিতে। সে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, মা বাবার সার্ট ইস্ত্রি করে দাও।

'বাবুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে।'

'তাই দেখছি। তুই বোস।'

'আমি এখন গোসল করব বাবা। পানি গরম করা হয়েছে, দেরি করলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'গোসল ঠাণ্ডা পানি দিয়েই করতে হয়। শীতকালে গোসল করতে হয় বরফ শীতল পানি দিয়ে।'

‘গরম কালে ফুটন্ত পানি দিয়ে ?‘

‘গরম কালে লিউকওয়ার্ম পানি দিয়ে। খবরের কাগজ পড়তে বলেছিলাম, পড়েছিস ?‘

‘হুঁ।‘

‘চোখে পড়ার মত কি পেয়েছিস ?‘

‘তেমন কিছু পাইনি।‘

‘তোদের সমস্যা কি জানিস ? তোদের সমস্যা হচ্ছে তোরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আশে পাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। উৎসাহও নেই। আজকের খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজে একজন কুষ্ঠরোগীর কথা ছাপা হয়েছে। সে আসলে কুষ্ঠরোগী নয়। মেকাপ নিয়ে রোগী সাজত। ফার্মগেটের ওভারব্রীজে শুয়ে ভিক্ষা করত। সে ধরা পড়েছে। সমস্ত কাগজের ফ্রন্ট পেজে তার ছবি, বিশাল নিউজ।‘

‘অরু ক্ষীণ স্বরে বলল, ভেরী ইন্টারেস্টিং।‘

জামিল সাহেব কড়া গলায় বললেন, মোটেই ইন্টারেস্টিং নয়। একজন অসহায় মানুষ রোগী সেজে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে সেই খবর দেশের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ হতে পারে না।‘

‘তা তো বটেই।‘

‘তুই কোন কিছু না বুঝেই বললি, তা তো বটেই।‘

‘গোসল করতে যাই বাবা। পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।‘

জামিল সাহেব জবাব দিলেন না। বিরক্ত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

অরু গোসল শেষ করে এসে দেখল, বাবুর ডিম ভক্ষণ পর্ব শেষ হয়েছে। এখন চলছে দুধপান পর্ব। দুধও ডিমের মত চামুচে করে খাওয়ানো হচ্ছে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অরু বলল, আপা একটা কাজ কর, ফুটবলের পাম্পার কিনে আন। তারপর সেই ফুটবল পাম্পারে দুধ ভরে বাবুর মুখে পাম্প করে দাও।

মীরু বলল, এইসব রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

‘তোমার তো এখন পৃথিবীর কোন কিছুই ভাল লাগে না।‘

মীরু বলল, তুই সব সময় আমার পেছনে লাগিস না তো অরু, আমার অসহ্য লাগে। আর শোন আজ বিকেলে বাসায় থাকবি - আবরার সাহেব টেলিফোন করেছিলেন। কথার ভঙ্গি দেখে মনে হল বিকেলে আসবেন।

'আসবেন বলেছেন ?'

'সরাসরি বলেন নি। জিজ্ঞেস করছিলেন তোর কথা। আমি বললাম, বন্ধুর বাড়িতে গেছে। রাতে থাকবে। সেই বন্ধুর টেলিফোন আছে কি-না জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'ও।'

'তুই আজ বিকেলে বাসায় থাকবি কি-না জানতে চাচ্ছিলেন। আমি বলেছি থাকবে। আপনি আসতে চাইলে আসুন।'

'কি বললেন, আসবেন ?'

'কিছু বলেন নি। আসবেন তো বটেই। তুই বিকেলে বাসায় থাকিস।'

'আমি বাসায়ই থাকব। যাব আর কোথায় ?'

গোসল করে এক কাপ গরম চা খাবার পর পর অরুর ঘুম কেটে গেল। একটু আগে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল - এখন ঘুম নেই। শরীরে কোন ক্লান্তিবোধও নেই। সে ঠিক করল, আবরারকে লেখা চিঠিটা শেষ করে ফেলবে। আজ যদি আসেন তাঁকে হাতে হাতে দেবে। না এলে বাসায় গিয়ে দিয়ে আসবে। সে বিয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিয়ে হয়ে গেছে আর অপেক্ষা করার কিছু নেই।

অরু দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারে না। অনেক কিছু লেখার জন্যে সে কাগজ কলম নিয়ে বসে, খানিকটা লেখার পর মনে হয় সব লেখা হয়ে গেল। সেই অর্থে আবরারকে লেখা তার চিঠিটা বেশ দীর্ঘ বলা যেতে পারে। চিঠিতে সম্বোধন নেই। কি সম্বোধন দেয়া যায় অনেক ভেবেও সে বের করতে পারেনি - সুজনেষু, প্রিয়জনেষু, শ্রদ্ধাষ্পদেষু ... কোনটাই মানায় না। তাছাড়া চিঠি যতটুকু লিখে রেখেছে তার কাছে ভাল লাগেনি। মনে হয় পুরো ব্যাপারটা আরো সুন্দর করে আরো গুছিয়ে লেখা যেত।

"আপনি নিশ্চয়ই আমার এই দীর্ঘ চিঠি দেখে আঁৎকে উঠে ভাবছেন, ব্যাপারটা কি ? হাতের লেখা দেখেও নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন। ভাবছেন এই মেয়েটার হাতের লেখা এত বাজে কেন। এ জীবনে আমি যত বকা খেয়েছি তার শতকরা ৬০ ভাগ হচ্ছে খারাপ হাতের লেখার

জন্যে। এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি.-তে আমি কোনমতে টেনে টুনে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি। আমার ধারণা, আমি আরো ভাল করতাম। একজামিনাররা হয়ত আমার হাতের লেখা পড়তেই পারেন নি। আপনিও পড়তে পারছেন কি-না জানি না। পুরো চিঠি যদি না পড়েন তাহলে একজামিনারদের মত আপনিও আমাকে অনেক কম নম্বর দেবেন। দয়া করে পড়ুন।

বুধবার আমার বিয়ে হবার কথা, আজ সোমবার। বিয়ের এখনো দু'দিন দেরি। আমি ঠিক করে রেখেছি চিঠি শেষ করে রাখব, আপনাকে দেব না। আপনাকে দেয়া হবে বিয়ের এক দিন পর। যেহেতু আপনি এখন চিঠি পড়ছেন আপনি ধরে নিতে পারেন যেদিন বিয়ে হবার কথা ছিল সেদিনই হয়েছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আপনার তুলনায় সে অতি নগন্য মানুষ, কমনার। এম.এ. পাশ করেছে - কোনমেতে একটা সেকেণ্ড ক্লাস জোগাড় করেছে। চাকরির সন্ধানে ঘুরছে শিকারী কুকুরের মত। যেখানেই তার মনে হয়েছে চাকরির সম্ভাবনা আছে সেখানেই সে উপস্থিত হয়েছে। আপনি শুনলে নিশ্চয়ই হাসবেন চাকরির জন্যে সে ময়মনসিংহের মদনের এক পীড় সাহেবের মাজার জিয়ারত করে এসেছে। এখনো কিছু হয়নি। চট করে যে হবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। দেশের চাকরি-বাকরি এখন পীর-ফকিরদের হাতে না। যাদের হাতে তারা মুহিবকে চাকরি দেবে না।

বুঝতেই পারছেন ওর নাম মুহিব। যেসব জিনিস মেয়েরা পছন্দ করে না তার সবই মুহিবের মধ্যে আছে। রুচি এক বস্তু তার নেই। এমন সব কুৎসিৎ রঙের শার্ট পরে সে আসে যা সুস্থ মাথায় কোন মানুষ কিনতে পারে না। একবার সে গোলাপী রঙের এক হাওয়াই শার্ট পরে উপস্থিত হয়েছিল। সিল্কের শার্ট। সেকেণ্ড হেণ্ড মার্কেট থেকে তেত্রিশ টাকায় কিনেছে এবং তার ধারণা হয়েছে এত সুন্দর শার্ট সে তার জীবনে আগে কখনো পরে নি। সে অসম্ভব ভীরু। একদিন তাকে নিয়ে আমি পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি হঠাৎ বদ টাইপের এক আধবুড়ো লোক ইচ্ছে করে আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, ঐ বুড়োটাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর তো এটা কেন করল। মুহিব বলল, আহা বাদ দাও না। পথ চলতে ধাক্কা লাগে না ?

আমি কঠিন গলায় বললাম, পথ চলতে ধাক্কা এটা নয়। তুমি এক্ষুণি গিয়ে বুড়োকে ধরে আন।

মুহিব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি নাটক করতে পারব না। বুড়ো যদি ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েই থাকে তাহলে আমি এখন বললে তো ধাক্কা ফেরত চলে যাবে না।

'তা যাবে না - তবে সে সাবধান হবে।'

'তাকে সাবধান করার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছা করছে না। তুমি পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাও তো। তুচ্ছ জিনিস মনে ধরে রাখলে চলে না।'

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। তার কাছে সবই তুচ্ছ জিনিস। সে থাকে তার বোনের সঙ্গে। তার দুলাভাই তাকে দিনরাত অপমান করে। অপমানের দু'একটা নমুনা শুনে আমার মাথায় আগুন ধরে গেছে। সে নির্বিকার - তার কাছে এসব হচ্ছে তুচ্ছ জিনিস।

তার টাইপ সম্পর্কে বুঝবার জন্যে একটা ঘটনার শুধু উল্লেখ করি। আপনি অসম্ভব বুদ্ধিমান। একটি ঘটনা থেকে তার চরিত্র ধরে ফেলতে পারবেন। বেশিদিন আগের কথা না, মাস তিনেক হবে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছি। সে হঠাৎ বলল, এক সেকেণ্ড দাঁড়াও বাথরুম সেরে আসি।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, কোথায় বাথরুম সারবে ?

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, রাস্তার পাশে। ড্রেন আছে তো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব। নো প্রবলেম।

আমি বললাম, রাস্তায় শত শত লোক যাচ্ছে এর মধ্যে তুমি বাথরুম সারবে ?

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি প্রায়ই এরকম কর ?'

'আমার মত যুবক, যাদের কাজই হচ্ছে সারাদিন শহরে ঘুরে বেড়ানো - বাথরুম সারার কাজ তাদের এভাবেই করতে হয়। এটাতো সান্‌ফ্রানসিসকো শহর নয় যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাবলিক টয়লেট থাকবে।'

'তুমি যদি সত্যি এরকম কর তাহলে আমি কিন্তু চলে যাব। আর কখনো আমার দেখা পাবে না।'

'তুমি চাও আমি ব্লাডার ফেটে মারা যাই ?'

এই বলে সে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাস্তার পাশের একটি আম গাছের দিকে এগিয়ে গেল। এ থেকে আপনি নিশ্চয়ই ওর মানসিক গঠন বুঝতে পারছেন ... আপনার সঙ্গে ওর কোনই মিল নেই ...'

চিঠি এই পর্যন্ত পড়েই অরুর ঘুম পেয়ে গেল। ময়নার মা ঘরে ঢুকে বলল, আফা আপনেরে বড় আফা ডাকে। অরু বিরক্ত মুখে বলল, কেন ?

'বাবু বমি করতেছে।'

'বমি করবে তা তো জানা কথাই - এতক্ষণ যে করে নি তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। আপাকে গিয়ে বল আমি যেতে পারব না। আমি এখন ঘুমুব। খবর্দার দুপুরে আমাকে ডাকতে পারবে না। ভাত খাওয়ার জন্যেও ডাকবে না। যদি টেলিফোন আসে বলবে আমি বাসায় নেই।'

ময়নার মা চলে যাবার পর মীরু দরজা ধরে দাঁড়াল। রাগী গলায় বলল, বাবু বমি করছে আর তুই আসছিস না। তুই তো দিন দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছিস অরু।

অরু বলল, আমি ঘুমুচ্ছি আপা। আমাকে ডিসটার্ব করো না। বমি করে বাবুর পেট খালি হয়ে গেছে। ওকে আবার ডিম দুধ খাওয়াও।

'তুই এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন ?'

'কেমন হয়ে যাচ্ছি ?'

'একজন ইনসেনসেটিভ মানুষ। দয়ামায়া নেই ...।'

'আমার দয়ামায়া দেখানো ঠিক হবে না আপা। আমি দয়ামায়া দেখাতে গেলেই সবাই বলবে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। এটা ঠিক হবে না।'

'তোর দুলাভাই তোকে গত মাসে চিঠি লিখেছে। তুই জবাব দিয়েছিস ?

'না।'

'না কেন ?'

'সবাইকে কি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে ? চিঠি লেখা যায় খুব সিলেকটেড ক'জনকে। দুলাভাই তার মধ্যে পড়েন না।'

মীরু রাগ করে চলে গেল। অরু আবরারকে লেখা চিঠিটা আবার পড়ল। পছন্দ হল না। আরো গুছিয়ে লিখতে হবে। হাতের লেখাও ভাল হয় নি। লাইন টানা কাগজে লিখতে হবে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুম ঘুম অবস্থায় লেখা চিঠিগুলো সুন্দর হয়। কেমন করে যেন চিঠিতে কিছু স্বপ্ন ভাব চলে আসে।

অরু খাতা নিয়ে উপুড় হল। পায়ের উপরে চাদর ছড়িয়ে দিল। জানালা দিয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। খুব আরাম লাগছে। অরু লিখতে শুরু করল। প্রথমেই সম্বোধন। সম্বোধনটাই কঠিন। সম্বোধনে অনেকখানি বলা হয়ে যায়। অরু লিখল 'প্রিয়তমেষু'। এই সম্বোধনের চিঠি আবরার সাহেবকে পাঠানো যায় না। এই চিঠি মুহিবের জন্যে। এটা মন্দ না। মুহিব ফিরে এলে সে অনেকদিন দেখা করবে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, কিংবা চলে যাবে মামারবাড়ি - কেন্দুয়ায়। মুহিব যখন চিন্তায় চিন্তায় অস্থির তখন হঠাৎ চিঠি পাবে।

প্রিয়তমেষু,

তুমি ভোরবেলা হুট করে চলে গেলে। এটা একদিকে ভালই হয়েছে। আমি নিজেকে গুছিয়ে নেবার সময় পেয়েছি। বিরহে কাতর হইনি। গল্প উপন্যাসের নায়িকারা সম্ভবত বিরহে কাতর হয়ে কাঁদতে বসত। আমি কি করেছি জান ? আমি খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজে নিজেই আরেক কাপ চা বানিয়ে খেলাম। চা শেষ করার আগেই তোমার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী এসে উপস্থিত। রাতে আমাদের ফেলে রেখে দু'জনেই চলে গিয়েছিল এই দুঃখে তারা কাতর। তোমার বন্ধু বজলু সাহেব একটু পর পর বলছেন - ভাবী, আমি একটা ছাগল। শুধু ছাগল না, রামছাগল। আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিন। বেচারার ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি দেখে মায়া লাগছিল। তিনি অবশ্যি তোমাকেও একটু পর পর রামছাগল বলছেন কারণ তুমি আমাকে ফেলে চলে গেছ। বজলু সাহেবের স্ত্রী আমাকে আরালে নিয়ে একগাদা প্রশ্ন করলেন। সেই সব প্রশ্নের সত্তুর ভাগ চুড়ান্ত রকমের অশ্লীল। এই মহিলার অশ্লীল কথাবার্তার দিকে মনে হয় খুব ঝোঁক আছে। শুরুতে তাঁর কথাবার্তা শুনে রাগ লাগছিল। তারপর অবশ্যি রাগ দূর করে হেসে হেসে আমিও বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলেছি।

বাসায় ফেরার সময় খুব টেনশান হচ্ছিল। ভেবেছিলাম বাসায় ভয়াবহ কিছু হয়ে গেছে। বাবার হার্টের অসুখ। তাঁর মাইল্ড স্ট্রোক জাতীয় কিছু হওয়া বিচিত্র না। হবার সম্ভাবনাও অনেকখানি। কারণ হচ্ছে বাবা তাঁর পছন্দের একটি ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক ঠাক করে রেখেছেন। বাবা হচ্ছেন সেই জাতের মানুষ যাঁরা মনে করেন এই পৃথিবীতে তাঁদের মতামতটাই প্রধান। অন্য কারোর কোন মতামত থাকতে পারে না। থাকা উচিত না। ঐ ছেলের সঙ্গে বাবার

পরিচয় কি করে হল শোন। একদিন বাবার খুব মাথাব্যাথা। তিনি প্যারাসিটামল কেনার জন্যে একটা ফার্মেসীতে গেলেন। দশটাকার প্যারাসিটামল কিনে মানিব্যাগের জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন মানিব্যাগ আনেন নি। বাবা বললেন, টাকা আনতে ভুলে গেছি। পরে এসে টাকা দিয়ে নিয়ে যাব। দোকানদার বলল, আচ্ছা। সে ওষুধ তুলে রাখল। দোকানে বসা অল্প বয়স্ক একটা ছেলে বলল, রমিজ মিয়া ওষুধ দিয়ে দিন। ছেলেটা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আবার যখন এদিকে আসবেন তখন টাকা দিয়ে দিবেন।

বাবা বললেন, তার প্রয়োজন নেই। আমি টাকা দিয়েই ওষুধ নেব। আপনার ভদ্রতার জন্যে ধন্যবাদ। এই ভদ্রতা কি আপনি সবার সঙ্গে করেন ?

'জ্বি না। আপনি দশ টাকার ওষুধ কিনেছেন বলে ভদ্রতাটুকু করতে পারছি। এক হাজার টাকার ওষুধ কিনলে করতে পারতাম না। তার কারণও আছে, একবার একটা লোক দু'শ টাকার ওষুধ কিনে বলল, টাকা আনতে ভুলে গেছি। এক্ষুণি টাকা এনে দিচ্ছি। সেই এক্ষুণি এখনো শেষ হয় নি। তিন মাস হয়ে গেল।'

বাবা বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে গেলেন। ওষুধ কিনলেন। ছেলেটির সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল, জানা গেল সে ডাক্তার। গত বছর মাত্র পাশ করেছে। কথা বলে বাবা মুগ্ধ।

বাবা সহজে মুগ্ধ হন না। তিনি সহজে যা হন তা হল বিরক্ত। তিনি যখন মুগ্ধ তখন ধরে নিতে হবে মানুষটার মধ্যে মুগ্ধ হবার মত কিছু আছে।

ভদ্রলোক কয়েকবার এলেন আমাদের বাসায়। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। বাবা কেন মুগ্ধ হলেন তা জানাই ছিল আমার আগ্রহের প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বাবার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম। মিলিয়ে মন খারাপই হল। আবরার সাহেবকে একশতে নব্বুই দিলে তুমি পাও চল্লিশ। মানুষটা অসম্ভব ভদ্র। মেকি ভদ্রতা না - আসল জিনিস। বাবা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, ছেলেটা কেমন ?

আমি বললাম, ভাল।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, বি স্পেসিফিক। কেন ভাল ?

'তার সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান মানুষ।'

'আর কিছু ?'

'উনি খুব ভদ্র।'

'আর কিছু আছে ?'

'আর মনে পড়ছে না বাবা।'

'তার খারাপ কোন দিক চোখে পড়েছে ?'

'উনি খানিকটা ফর্মাল।'

'ইনফর্মাল হবার মত পরিচয় তো হয় নি যে ইসফর্মাল হবে। এ ছাড়া আর কোন পয়েন্ট আছে ?'

'উনার মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য আছে।'

'কাঠিন্য মানে ?'

'উনার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন উনাকে আমার কেন জানি মাস্টার মাস্টার মনে হয়।'

'এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না ?'

'জ্বি-না।'

ভাল কথা। আমি এই ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার কথা চিন্তা করছি। প্রাথমিক আলোচনা ছেলের বাবার সঙ্গে করেছি। তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহী। আমি ছেলের ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে আরো কিছু খোঁজ নেব। তারপর ফাইনাল কথা বলব। তোকে খবরটা দেয়া দরকার বলেই দিচ্ছি। তোর মতামত চাচ্ছি না। বুঝতে পারছিস ?'

'পারছি।'

'একটা কথা তোকে বলা দরকার - এই ছেলে এম বি বি এস ফাইন্যাল পরীক্ষায় গত পনের বছরের রেকর্ড ভেঙ্গেছে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্কলারশীপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা গাধা টাইপ ছেলের সঙ্গে মহা সুখে জীবচন যাবন করার চেয়ে, ব্রাইট ছেলের সঙ্গে মোটামুটি সুখে জীবন যাপনও আনন্দের - এই কথাটা মনে রাখবি। আচ্ছা এখন যা।'

তুমি তো বাবাকে চেন না। কাজেই বুঝতে পারছ না যে বাবার মুখের উপর কথা বলা সম্ভব না। আমি কিছুই বললাম না। তার চারদিন পরে ছেলের মা আমাকে দেখতে এলেন। মহিলার মনটা মায়ায় ভর্তি। তিনি এসে কি করলেন জান ? আমাকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ খুব কাঁদলেন। তারপর একটা মুক্তো বসানো আঙটি আমার হাতে পড়িয়ে দিলেন। সেই আঙটি আমি সারাক্ষণ হাতে পরে থাকি। এখনো আমার হাতে আছে। শুধু বিয়ের দিন খুলে ভ্যানিটি ব্যাগে রেখেছিলাম। আঙটি পরে থাকতে হয় বাবার ভয়ে। বুঝলেন সাহেব ? আপনি কি বুঝতে

পারছেন আমি কি সমস্যায় আছি ? না পারছেন না। শুধু রাগ করছেন এত ঘটা করে ঐ ছেলের কথা লিখলাম বলে। এখন যে কথাটি লিখব তা পড়লে তোমার সব রাগ চলে যাবে। কথাটা হচ্ছে - আমি আমার সমগ্র জীবনের বিনিময়ে তোমাকে চেয়েছিলাম। তোমাকে পেয়েছি। পৃথিবীর কাছে আমার আর কিছুই চাইবার নাই।

অরুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে খাতা বন্ধ করে বালিশের নীচে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যে বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখল - মুহিব বেড়াতে এসেছে তাদের বাসায়। খালি গায়ে এসেছে। মুহিব গম্ভীর মুখে বলল, অরু তুমি তোমার বাবা মা'কে ডেকে আন। আমি উনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। খালি হাতে আসিনি। মিষ্টি নিয়ে এসেছি। দু'কেজি স্পঞ্জ রসগোল্লা।

অরু বলল, তুমি খালি গায়ে এলে ?

'খালি গায়ে না এসে কি করব ? তুমি আমার পাঞ্জাবীটা পুড়িয়ে ফেললে না ? পাঞ্জাবীটা পরে আসব বলে ভেবেছিলাম।'

'এইভাবে তো তুমি বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।'

'তাহলে কি করব, চলে যাব ?'

'না, চলে যাবে কেন ? আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাক। আমি তোমার জন্যে চট করে একটা পাঞ্জাবী বানিয়ে দি।'

'পারবে ?'

'অবশ্যই পারব। কাপড় কেনা আছে।'

'সময় লাগবে না তো ?'

'না, সময় লাগবে না। সিম্পল পাঞ্জাবী বানাবো। গলায় একটু হালকা সুতার কাজ করে দেব।'

'দেরী হবে না তো ?'

'না, দেরী হবে না।'

স্বপ্নের পরবর্তী অংশে দেখা গেল অরুর বিছানায় শুয়ে মুহিব ঘুমুচ্ছে। তার গায়ে সাদা চাদর। অরু মেঝেতে বসে পাঞ্জাবীর গলায় সুতোর কাজ করছে। কাজটা খুব দ্রুত করতে হচ্ছে

বলে সুচ বার বার আঙ্গুলে ফুটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্ত লেগে যাচ্ছে পাঞ্জাবীতে। অরু যতই তাড়াহুড়া করছে ততই পাঞ্জাবীর গায়ে রক্ত মেখে যাচ্ছে।

॥ ৫ ॥

মহসিন বলল, শালা হারামী।

এই-জাতীয় গালি সে কিছুক্ষণ পর পর দিচ্ছে। যাকে দেয়া হচ্ছে সে অবশ্যি শুনছে না। সে দশটনি ট্রাক নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। যার পেছনে বাম্পারে লেখা - মায়ের দোয়া।

এই ট্রাক ড্রাইভার মহসিনকে সাইড দিচ্ছে না। অন্যদের দিচ্ছে কিন্তু মহসিনের পিক-আপকে দিচ্ছে না।

ট্রাক ভর্তি করোগেটেড টিনের শীট। টিনের শীটের উপর দুজন কুলী মাথায় গামছা বেঁধে বসে আছে। দু'জনের হাতেই বিড়ি। তারা খুব মজা পাচ্ছে। সাইড চেয়ে যে কোন গাড়ি হর্ণ দেয়া মাত্র ট্রাক তাকে সাইড দিয়ে দিচ্ছে। শুধু যখন মহসিন হর্ণ দিচ্ছে তখন ট্রাক চলে যাচ্ছে মাঝ রাস্তায়। ট্রাকে বসে থাকা কুলী দু'জন দাঁত বের করে হাসছে। তারা খুব মজা পাচ্ছে।

মুহিব বলল, পাল্লা দিয়ে লাভ নেই ড্রাইভার সাহেব। ও সাইড দিবে না।

মহসিন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, সবেরে দিতেছে, আমারে দিব না কেন ?

'কে জানে কেন ? কোন একটা তামাশা করছে। আমাদের আগে যাবার দরকার নেই, আমরা পেছনে পেছনেই যাই।'

'ট্রাকের পেছনে থাকলে রাস্তা দেখা যায় না। চালাতে অসুবিধা।'

'তাহলে আসুন এক কাজ করি। চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামান। আমরা চা খাই। ট্রাক এর মধ্যে চলে যাক।'

'এই হারামজাদাকে ওভারটেক না করতে পারলে আমি বাপের ঘরের না।'

'কোনই দরকার নেই ভাই। আপনি গাড়িটা থামান, আমরা চা খাই। চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে।'

মহসিন নিতান্ত অনিচ্ছায় গাড়ি থামাল। মুহিব প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে চা খেল। লীনাও মুহিবের সঙ্গে নেমেছে। সেও চা খাবে। তাকে পিরিচে করে চা দেয়া হয়েছে। সে চা খাচ্ছে। লম্বা ঘুম দেওয়ায় তার নিজস্ব ব্যাটারী চার্জ হয়ে গেছে। সে ক্লাস টু'র বাংলা বইয়ের সব ছড়া একের পর এক শুনিয়ে যাচ্ছে। ছড়া বলছে হাত পা নেড়ে। ছড়া বলার ফাঁকে ফাঁকে পিরিচে চা ঢেলে তার মুখে ধরে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। মুহিবকে লীনা এখন ডাকছে - ছোট মামা। ছোট মামা কেন ডাকছে সেই জানে।

‘ছোট মামা ?‘

‘কি ?‘

‘রং তুলি কবিতা শুনবে ?‘

‘বল।‘

‘রং তুলিতে ছোপ ছাপ
মাঠের পাশে ঝোপ ঝাপ।
ঝোপের পাশে সোনার গাঁও
একটুখানি বসে যাও।‘

মহসিন গম্ভীর মুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মেজাজ ভয়ংকর খারাপ। কেন জানি তার ধারণা হয়েছে যে তাদের পেছনে না দেখে ট্রাকটাও থেমেছে। অপেক্ষা করছে কখন আবার আসে। যেই সে পিক-আপ নিয়ে দেখা দেবে ওমনি ট্রাক ড্রাইভার আগের ফাজলামী শুরু করবে। হারামজাদা।

লীনা চা শেষ করে বলল, নাচ দেখবে ছোট মামা ?

‘এখানে নাচবে ?‘

‘হুঁ। আমি সব জায়গায় নাচতে পারি।‘

‘এখন তো আমরা রওনা হব। আমরা বরং চিটাগাং পৌঁছে নাচ দেখব।‘

‘তাহলে কবিতা বলি ?‘

‘বল।‘

‘খোকন খোকন ময়না
পরিয়ে দেব গয়না
খোকন যাবে মামার বাড়ি
আর যে দেরি সয় না ...‘

মহসিন যা ভেবেছিল তাই।

তারা রওনা হয়েছে পনেরো মিনিট পর। এই পনেরো মিনিটে ট্রাকের অনেক দূর চলে যাওয়ার কথা। তা যায়নি। মহসিন পিক-আপ নিয়ে কিছুদূর এগোতেই দেখল ট্রাক। কুলী দু'জন পিক-আপের দেখা পাওয়া মাত্র আনন্দে হেসে ফেলল। মহসিন বলল, হারামজাদা, কুত্তা।

মুহিব বলল, ড্রাইভার সাহেব আপনি ওদের লক্ষ্য করবেন না, নিজের মত চালান।

মহসিনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। চোখ লালচে। সে বিড় বিড় করে কি যেন বলল। ট্রাকে বসে থাকা কুলী দু'জন দাঁত বের করে হাসছে। একজন আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। মহসিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা।' আর ঠিক তখনি ট্রাক সাইড দিল। ট্রাক ড্রাইভার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারা করল চলে যেতে। মহসিন তাই করল। নিমিষে ট্রাকের পাশাপাশি চলে এল। ভুল যা করার তা এর মধ্যেই হয়ে গেছে। মহসিনের সামনে কোকাকোলা কোম্পানীর মাইক্রোবাস। পেছনে যাবার উপায় নেই। পেছনে ঢাকা-চিটাগাং লাইনের বিরাট একটা হিনো বাস। বাস ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ণ দিচ্ছে। কান ঝাঝা করছে। ট্রাক ড্রাইভার কি ইচ্ছে করে তাকে এই বিপদে ফেলেছে ? না রসিকতা ? মহসিনের ত্রিশ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগছে না। মাথা কাজ করছে না। চোখের দৃষ্টিও ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে, স্টিয়ারিং হুইল হয়ে গেছে পাথরের মত শক্ত। মহসিন চোখ বন্ধ করে ফেলল।

লীনা শক্ত করে মুহিবের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

মাইক্রোবাস মুখোমুখি ধাক্কা দিয়ে মুহিবদের পিক-আপকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল।

॥ ৬ ॥

মীরুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আবীর দুপুর থেকে কিছু মুখে দিচ্ছে না। ঠোঁট শক্ত করে বন্ধ করে আছে। গা একটু গরম। সেই উত্তাপ অবশ্যি থার্মোমিটারে ধরা পড়ছে না। মীরুর ধারণা জ্বর আছে। সে খানিকক্ষণ পর পর ছেলের কপালে এবং বুকে হাত রাখছে।

মীরুর মা বেশ বিরক্ত হচ্ছেন। সেই বিরক্তি প্রকাশ করছেন না। মেয়ের আহ্লাদি প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। সহ্য করার চেষ্টা করছেন। মীরু মার ঘরে ঢুকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কি করি মা বলতো ?

রাহেলা আবেগশূন্য গলায় বললেন, আবার কি হয়েছে ?

'বাবুর গা গরম।'

'জ্বর-জ্বারি হয়েছে বোধহয়। বাচ্চাদের তো জ্বর-টর হবেই।'

'শ্বাস নেবার সময় কেমন যেন শাঁ শাঁ শব্দ হয়। বুকে বোধ হয় ঠাণ্ডা বসে গেছে।'

'আবরার আসবে বলেছে। ও এলে ওকে দেখা -'

'সে তো আর চাইল্ড স্পেশালিস্ট না।'

'চাইল্ড স্পেশালিস্ট খোঁজার মত কিছু হয় নি মীরু।'

'দুপুর থেকে কিছু মুখে দিচ্ছে না।'

'ক্ষিধে হচ্ছে না তাই মুখে দিচ্ছে না। তুই শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিস।'

'আবীরের বাবাকে একটা ট্রাংক কল করব মা ?'

'করতে চাইলে কর। তবে ছেলের অসুখের কথা না বলাই ভাল। চিন্তা করবে।'

মীরুর চোখ-মুখ মুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাসিমুখে বলল, টেলিফোনটা তোমার ঘরে নিয়ে আসি মা।

রাহেলা বললেন, নিয়ে আয়।

বাবার ঘর থেকে টেলিফোন করা বিরাট যন্ত্রনা। তিন মিনিটের বেশি কথা বললেই তিনি রেগে যান। পৃথিবীর কোন স্বামী-স্ত্রী কি পারে তিন মিনিটে তাদের কথা শেষ করতে ?

রাহেলার দাঁত ব্যাথা করছে। তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে আছেন। মীরু আবীরকে তাঁর পাশে বসিয়ে টেলিফোন আনতে গেছে। রাহেলা হাত বাড়িয়ে আবীরকে কোলে নিতে নিতে

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই মাসে মীরুর এটা দ্বিতীয় দফায় লং ডিসটেন্স কল। এক একটা কলে হাজার বার শ' করে বিল হয়। আজ এই মেয়ে কতক্ষণ কথা বলবে কে জানে। গত মাসে টেলিফোন বিল এসেছে ছয় হাজার টাকা। ছ' হাজার টাকা টেলিফোন বিল দেয়ার মত অবস্থা সংসারের নাই। তা এই মেয়ে বুঝবে না। তাঁর মেয়ে এত বোকা কখনো ছিল না। বিয়ের পর বোকা হয়ে গেছে। মনে হয় আরো হবে। মানুষ নষ্ট হয় সঙ্গ দোষে। মীরুর স্বামী মুখলেসুর রহমানই মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে দিচ্ছে।

মুখলেসুর রহমান স্বভাব-কৃপণ। চালিয়াত ধরনের ছেলে। এক বছরের মত বাইরে আছে, একবারও টেলিফোন করেনি। ডলার নষ্ট হবে। স্ত্রীর হাতখরচের টাকাও আসছে না। চিঠি লিখেছে - কষ্ট-টষ্ট করে চালিয়ে নাও। ডলার জমাচ্ছি। পরে কাজে লাগবে। তোমার বাবার কাছ থেকে কিছু ধার নাও। আমি দেশে এসে শোধ করব।

আবীরের জন্মের সময়ও এই ব্যাপার। ক্লিনিকে বাচ্চা হল। নরমাল ডেলিভারী নয়, সিজারিয়ান। সতেরো হাজার টাকা বিল। সেই টাকা তাঁদেরকে দিতে হয়েছে। কারণ জামাই হাসিমুখে বলেছে - টাকাটা কি আপনারা দেবেন না আমি দেব ? আপনার মেয়ে বলছিল, আমি দিলে আপনারা মাইণ্ড করবেন। এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি।

রাহেলা বললেন, আমিই দেব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

'ভাবছি না তো মা। মোটেও ভাবছি না। তবে এই সব পুরনো নিয়ম-কানুন বদলানো উচিত। বিয়ের পর মেয়ের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর। বাবা-মা'র এই সব নিয়ে ভাবা উচিত না।'

এক বৎসর ধরে স্ত্রী, পুত্র ফেলে সে নিউ জার্সিতে আছে। ইচ্ছা করলেই দুজনকে নিয়ে যেতে পারে। তা নেবে না। তাতে ডলার 'সেভ' হবে না।

মীরু বাবার ঘরে ঢুকল। বাবা চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। মীরু ভয়ে ভয়ে টেলিফোনের প্ল্যাগ খুলল। জামিল সাহেব কড়া গলায় বললেন, টেলিফোন নিচ্ছিস কোথায় ?

মীরু ক্ষীণস্বরে বলল, মা জানি কোথায় টেলিফোন করবে।

'সেটা আমার ঘর থেকে করতে পারে না ? গোপনে করতে হবে ? সব জিনিসের একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে। আলনা থাকবে আলনার জায়গায়। টেলিফোন থাকবে টেলিফোনের

জায়গায়। টেলিফোন তো মানুষ না যে একেক সময় একেক জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। যা তোর মা'কে আসতে বল।'

'আচ্ছা।'

মীরু এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি টেলিফোনটা এ ঘরে এনে দাও মা। বাবা আনতে দিচ্ছে না।

রাহেলা টেলিফোন এনে দিলেন। মীরু তৎক্ষণাৎ নিউ জার্সিতে কল বুক করল।

রাহেলা লক্ষ্য করলেন, মীরু টেলিফোন সেটের পাশে মূর্তির মত বসে আছে। আগ্রহে এবং আনন্দে তার চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। রাহেলার খুব মায়া লাগছে। তাঁর কাছে টাকা থাকলে তিনি টিকিট কেটে মেয়েকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

মীরু বলল, মা আজ কিন্তু একটু বেশিক্ষণ কথা বলব।

'আচ্ছা।'

'তুমি আবীরকে নিয়ে একটু অন্য ঘরে যাও তো মা।'

রাহেলা আবীরকে নিয়ে উঠে গেলেন আর তার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বাজল। না নিউ জার্সি থেকে কোন কল না। মগবাজার থেকে বজলু নামের একটা লোক টেলিফোন করছে। অরুকে চাচ্ছে।

মীরু বলল, ওকে তো এখন দেয়া যাবে না। আপনার যা বলার আমাকে বলুন।

'তাকেই দরকার। জরুরী একটা খবর দেব।'

'বললাম তো তাকে দেয়া যাবে না। সে ঘুমুচ্ছে। শরীর ভাল না। আপনি পরে টেলিফোন করুন। আমি এখন আমেরিকা থেকে একটা কল এক্সপেক্ট করছি।'

'আপনি কি দয়া করে উনাকে বলবেন যে মুহিব এক্সিডেন্ট করেছে। অবস্থা খুব খারাপ। ঢাকা মেডিক্যালে ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে।'

'মুহিবটা কে?'

উনাকে বললেই চিনবেন।

'আচ্ছা বলব। আপনি লাইনটা ছাড়ুন। আমিও খুব জরুরী একটা কল এক্সপেক্ট করছি।'

'আপনি দয়া করে খবরটা দেবেন। বলবেন বজলু টেলিফোন করেছিল।'

'বলব।'

বজলু নামের অপরিচিত এই মানুষটা টেলিফোন রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিউ জার্সির কল পাওয়া গেল। মীরু দশ মিনিট কথা বলল। এই দশ মিনিটে তিনবার কাঁদল। দু'বার ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বুঝতে পারছি তুমি আমাকে ভালবাস না।

অরুকে যে খবরটা দেয়ার কথা মীরু সেই খবর দিল না। কারণ তার কিছুই মনে নেই। প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে কথা বললে তার এরকম হয় - সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। শরীর ঝন ঝন করতে থাকে। সেই রাতে এক ফোঁটা ঘুম আসে না। গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে থাকে।

অরুর ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে শীতের হাওয়া আসছে। আকাশ মেঘে মেঘে কাল। শীতের সময় আকাশে মেঘ করলে কেন জানি খুব বিষন্ন লাগে। অরু বিছানা থেকে নামল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় খুব হাওয়া। গায়ে কাঁপন লাগছে।

মীরু বাটি ভর্তি দুধ নিয়ে রান্নাঘর থেকে আসছে। অরুকে দেখে কিশোরীর মত পরিষ্কার গলায় বলল, তোর দুলাভাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। দশ মিনিট কথা বললাম।

অরু হাই তুলতে তুলতে বলল, দুলাভাই টেলিফোন করলেন, না তুমি করলে ?

'আমি করলাম। আমেরিকা থেকে কল করা খুব খরচান্ত ব্যাপার। তাছাড়া লাইনও সহজে পাওয়া যায় না।'

'দুলাভাই শুধু লাইন পান না, আর সবাই পায়।'

'এই সব কি ধরনের কথা অরু ?'

'ঠাট্টার কথা আপা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করব না ?'

'তোর কথা টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিল।'

'বল কি ? কি সৌভাগ্য !'

'তোর বিয়ের তারিখ হয়েছে কি-না জানতে চাইল। আমি বললাম পৌষ মাসের মাঝামাঝি হবে।'

অরু হাসতে হাসতে বলল, দুলাভাই বড় বাঁচা বেঁচে গেলেন। যেহেতু বাইরে আছেন গিফট-টিফট কিছু দিতে হবে না। সুন্দর একটা কার্ড পাঠালেই হবে।

মীরু কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। অরু বলল, তুমি রাগ করছ না-কি ? দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করব না ?

‘এই জাতীয় ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। তোদের জন্যে দুলাভাইয়ের যে দরদ তার শতাংশের এক অংশ দরদও তোদের নেই।‘

‘তাই না-কি ?‘

এক বছর ধরে বেচারা বাইরে পড়ে আছে। আমি ছাড়া একবার কেউ কি তার সঙ্গে কথা বলেছে ? বাবার জন্মদিনে সে কার্ড পাঠিয়েছে। বেচারার জন্মদিন গেল। বাবা কি তাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছেন, না এক লাইনের একটা চিঠি লিখেছেন ?‘

‘বাবা জানতেন না কবে জন্মদিন।‘

‘কেন জানবে না ? আম বাবাকে গিয়ে বললাম, বাবা পঁচিশে অক্টোবর আবীরের বাবার জন্মদিন। বাবা বললেন, বুড়ো ধাড়ির আবার জন্মদিন কি ?

এইভাবে কেউ কথা বলে ? বলা উচিত ?‘

‘মোটেই বলা উচিত না।‘

মীরুর চোখে পানি এসে গেল। অরু বলল, এইসব কথা বাদ দাও আপা। দুলাভাই কেমন আছে বল।

‘ভাল আছে। একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, এখন ভাল।‘

‘আপা শোন। খুব সিনসিয়ারলি একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। খুব সিনসিয়ারলি - তোমার সবচে‘ প্রিয় মানুষটি কে ?‘

‘তোর দুলাভাই, আবার কে ?‘

‘আচ্ছা আপা, পৃথিবীর সব মেয়েরাই কি তাদের স্বামীকে তোমার মত ভালবাসে ?‘

মীরু বিরক্ত হয়ে বলল, স্বামীকে ভালোবাসবে না তো কি রাস্তার মানুষকে ভালবাসবে ? মাঝে মাঝে তুই এমন পাগলের মত কথা বলিস !

অরু অস্পষ্ট স্বরে বলল, পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তাদের ভালবাসাও কি আলাদা ? একজনের ভালবাসা নিশ্চয়ই অন্য একজনের ভালবাসার মত নয়।

মীরু বলল, বিড় বিড় করে কি বলছিস ?

অরু বলল, কিছু বলছি না।

বলতে বলতেই সে লক্ষ্য করল তার কেমন যেন লাগছে। মুহিবের পাশে থাকার জন্যে এক ধরনের তীব্র ব্যাকুলতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। চিটাগাং মুহিব কোথায় উঠেছে এটা কি খোঁজ

নিয়ে জানা যায় না ? সে যদি রাতের ট্রেনে চিটাগাং চলে যায়, ভোরবেলা মুহিবকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলে - 'তুমি কেমন আছ ? ...

মুহিব কি করবে ? খানিকক্ষণ তোতলাবে। বেশি রকম চমকালে সে তোতলাতে শুরু করে। কুৎসিৎ লাগে। বয়স্ক একজন মানুষ তো তো তো করছে ... জঘন্য।

কেমন হয় চিটাগাং চলে গেলে ? ট্রেনে করে একা একা চলে যাওয়া খুব কি সাহসের কাজ? গোপনে বিয়ে করে এরচে' অনেক বেশি সাহস কি সে দেখায়নি ? আচ্ছা ধরা যাক, একা যাওয়া সম্ভব না। সে তো অনায়াসে বজলুকে বলতে পারে - ভাই, আপনি আমাকে চিটাগাং নিয়ে চলুন। আমার খুব যেতে ইচ্ছা করছে। উনি নিশ্চয়ই রাজী হবেন।

ময়নার মা এসে বলল, আফা, আম্মা আপনারে ডাকে। অরু মার ঘরের দিকে রওনা হল।

রাহেলার দাঁতব্যাথা তীব্র হয়েছে। ওষুধপত্র এখনো কিছু খাচ্ছেন না। আবরার আসবে। তাকে জিজ্ঞেস করে খাবেন। অরু ঘরে ঢুকে বলল, মা ডেকেছ ?

'হুঁ।'

'দাঁতব্যাথা কি খুব বেশি ?'

'হুঁ।'

'কি জন্যে ডেকেছো মা ?'

'বাতি নিভিয়ে আমার পাশে বোস।'

অরু তাই করল। রাহেলা মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, তোর কি কোন সমস্যা আছে মা ?

অরু বিস্মিত হয়ে বলল, এই কথা কেন বলছ ?

'কোন কারণ নাই। হঠাৎ মনে হল। আছে কোন সমস্যা ?'

'না।'

'আজ কলেজ থেকে ফিরে শুনি তুই ঘুমাচ্ছিস। বলে দিয়েছিস তোর ঘুম যেন ভাঙ্গানো না হয়। আমি ভাবলাম, অসুখ-বিসুখ হয়েছে। তোর কাছে খানিকক্ষণ বসলাম। দেখি, ঘুমের মধ্যে তুই খুব কাঁদছিস।'

'দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম মা।'

'কি দুঃস্বপ্ন ?'

'আমি একটা পাঞ্জাবীতে সুতার কাজ করছি। সূঁচ বার বার আমার আঙ্গুলে ফুটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। সেই রক্তে পাঞ্জাবীটা মাখামাখি হয়ে গেল।'

'পাঞ্জাবীটা কার জন্যে বানাচ্ছিস ?'

রাহেলা শান্ত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। অরু চোখ ফিরিয়ে নিল। রাহেলা বললেন, ঠিক করে বলতো দেখি মা - আবরার ছেলেটিকে কি তোর পছন্দ না ?

'উনি চমৎকার একজন মানুষ।'

'অনেক সময় চমৎকার মানুষও মনে ধরে না। আমি লক্ষ্য করেছি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর থেকে তোর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা। ঘুমের মধ্যে তোকে যে আজই কাঁদতে দেখলাম তা না - আগেও দেখেছি।'

অরু কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন মীরু এসে বলল, আবরার সাহেব এসেছেন। একগাদা খাবার-দাবার নিয়ে এসেছেন। রাহেলা বললেন, ওকে এইখানেই নিয়ে আয়। তিনি অরুর চোখের দিকে তাকালেন। অরুর চোখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত হলেন - যা আশংকা করেছিলেন তা নয়।

বইমেলা

॥ ৭ ॥

সাদা রঙের পিক-আপ ধানক্ষেতে পড়ে আছে। ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে গাড়ির ভিড়। এরা কেউ থামছে না। বরং একসিডেন্টের কাছাকাছি তাদের গাড়ির গতি বেগ বেড়ে যাচ্ছে। এখন গাড়ি থামানোই সমস্যা। আহত মানুষদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এসে পড়তে পারে। কেই মারা গিয়ে থাকলে সমস্যা আরো বেশি। রাস্তা ব্লক হয়ে যাবে। দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টার মত গাড়ি চলবে না। মানুষজন জমবে, পুলিশ আসবে। গাড়ি ভাংচুরও হতে পারে। গাড়ি ভাংচুর হওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, কিছু একটা হলেই গাড়ি ভাঙ্গা হয়। কাজেই একসিডেন্ট হলে হবে। বড় বোকামী হবে গাড়ি থামিয়ে কি হয়েছে খোঁজ নিতে যাওয়া। গাড়ি চালক বা যাত্রী কারো হাতে সময় নেই। ফেরী ধরতে হবে। ফেরীর লম্বা লাইনে যেন পড়তে না হয়।

গ্রামের কিছু লোকজন পিক-আপ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বাচ্চা এবং মহিলাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। উল্টে যাওয়া পিক-আপ থেকে প্রথম বের হয়ে এল লীনা। তার চোখে ভয়ের চেয়ে বিস্ময় বেশি। সে ডাকল, আব্বু ও আব্বু।

লীনার বাবা বের হয়ে এলেন। বেরুল ড্রাইভার মহসিন। মহসিনের বাঁ হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তে সার্টের অনেকখানি ভিজে গেছে। তবে তার কাছে এই আঘাত খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, দাঁড়ায়ে তামাশা দেখতেছেন ? এদের গাড়ি থেকে বের করেন। আশেপাশে ডাক্তারখানা কোথায় আছে ?

গ্রামের মানুষগুলি কোন জবাব দিল না। একজন বুড়ো শুধু বলল, কয়জনের মৃত্যু হয়েছে ?

এতবড় একসিডেন্ট সেই তুলনায় ক্ষতি অল্প - গুরুতর আঘাত পেয়েছে শুধুমাত্র মুহিব। একমাত্র তারই জ্ঞান নেই। মাথার পেছন দিকের খানিকটা অংশ থেতলে গেছে।

মহসিন বলল, ইনারে খুব তাড়াতাড়ি কোন বড় হাসপাতালে নিতে হবে। আপনারা একটা ব্যাবস্থা করেন। ঢাকার দিকে যে গাড়িগুলি যাচ্ছে তার একটারে থামান।

মুহিবের মাথা কোলে নিয়ে একজন মহিলা বসে আছেন। ইনি লীনার মা। তাঁর আকাশী রঙের শাড়ি রক্তে মাখা মাখি হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা এক মনে দোয়া ইউনুস পাঠ করছেন -।

গ্রামের মানুষের এই দৃশ্য দেখার দিকেই বেশি আগ্রহ। আহত মানুষটিকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যাপারে তাদের তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। ঐ বুড়ো লোকটা লীনার মাকে বলল - "মানুষটা

আফনের কে হয় ?“ লীনার মা বললেন, আপনারা কেউ একটু পানি আনবেন ? উনারে পানি খাওয়াব। পানি আনার ব্যাপারে সবার খুব উৎসাহ দেখা গেল। এক সঙ্গে চার পাঁচ জন ছুঁটে গেল।

লীনার বাবা ঢাকার দিকে যাচ্ছে এমন কোন একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করছেন। হাত তুলে চিৎকার করছেন কেউ থামছে না। তিনি উপায় না দেখে হাত তুলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালেন, তবু কেউ থামছে না। তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সময় ছোট্ট লীনা একটা অসীম সাহসের কাজ করল। সেও বাবার মত দু'হাত তুলে রাস্তার একটা অংশ আড়াল করে দাঁড়াল। ঢাকাগামী একটা চেয়ারকোচকে যে কারণে বাধ্য হয়ে থামতে হল।

॥ ৮ ॥

ডাক্তার সাহেব বললেন, এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের যা করার আমরা করছি। আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। হৈচৈ, কান্না-কাটিতে সমস্যা হয়।

জেবা শান্ত স্বরে বলল, আমি তো কান্নাকাটি করছি না।

'তবু বাইরে থাকুন। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আমরা রুগীর আত্মীয়-স্বজন রাখি না। অবশ্যই মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন। চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার থাকবে, চিন্তার কিছু নেই।'

জেবা শেষ বারের মত তাকাল। মুহিব চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার পুরো মাথায় ব্যাণ্ডেজ। সেই ব্যাণ্ডেজ ভিজে উঠেছে রক্তে। চোখ বন্ধ, নাকের ভেতর নল ঢুকে গেছে। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। মুখ খানিকটা হা করা। দু'টি হাতেই স্ট্রাইপ দিয়ে বিছানার সঙ্গে বাঁধা। মুহিবের বুক উঠানামা করছে। জীবনের চিহ্ন বলতে এইটুকুই। ঘরটা ছোট। ছোট ঘরের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন সিলিণ্ডার। ঘরময় মাথা ধরে যাবার মত কড়া ফিনাইলের গন্ধ। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে। ছাদ থেকে ইলেকট্রিকের তার ঝুলছে। দেখলেই কেন জানি মনে হয় ফাঁসির দড়ি। ঘরে আলোও কম। মৃত্যুর সময় এই ঘরের রুগীরা পৃথিবীর অসুন্দর একটি অংশ দেখে যাবে।

জেবার মনে হল, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটগুলি খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা উচিত। এই ঘরটা থাকবে আলো বাতাসে ভরপুর। ফুলদানি ভর্তি থাকবে গোলাপের গুচ্ছ। বড় বড় জানালা থাকবে, যে জানালা দিয়ে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়।

জেবা বারান্দায় চলে এলেন। বারান্দায় অনেকেই আছে। মুহিবের বন্ধুরা এক কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বজলুকে ছাড়া জেবা অন্য কাউকে চেনে না। এরা কেউ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে না। দূরে দূরে আছে। এই ভাল। জেবার এখন সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই। বজলুকে দেখা যাচ্ছে বাচ্চা ছেলেদের মত মাটিতে বসে আছে। কিছুক্ষণ পরপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। তার স্ত্রী একটা হাত রেখেছে স্বামীর পিঠে। সেও কাঁদছে।

শফিকুর রহমান সাহেব তার মেয়ের হাত ধরে মুহিবের বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। অপরিচিত একজন ডাক্তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কি মনে করে যেন থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, নাম কি তোমার খুকী। সারা বলল, আমার নাম 'প্রিয়দর্শিনী'। শফিকুর

রহমান মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। 'প্রিয়দর্শিনী' নাম মুহিবের দেয়া। মেয়ের জন্মের পর পর মুহিব বলল, আপা, তোমার মেয়েটা তোমার মত সুন্দর হয়নি তবু আমি ওর নাম দিলাম 'প্রিয়দর্শিনী'। জেবা বললেন, তুই নাম দিতে গিয়ে ঝামেলা করিস না তো। তোর দুলাভাই নাম ঠিকঠাক করে রেখেছে। তুই নাম দিচ্ছিস শুনলে বিরক্ত হবে।

মুহিব বলল, তোমাদের নামে তোমরা ডাকবে। আমি ডাকব প্রিয়দর্শিনী। এই যে এই যে প্রিয়দর্শিনী, তাকান দেখি আমার দিকে। আমি আপনার মামা। দু'বার মা ডাকলে মামা হয়। কাজেই মামা কোন হেলাফেলা জিনিস না। দু'জন মা সমান সমান একজন মামা। এটা হচ্ছে এলজেব্রা। বড় হলে শিখিয়ে দেব। এখন দয়া করে একবার চোখ পিটপিট করুন যাতে আমি বুঝতে পারি, আপনি আমার কথা শুনেছেন। কি আশ্চর্য ! আপা দেখ দেখ, চোখ পিট পিট করছে। প্রিয়দর্শিনী আমার কথা শুনেছে।

শফিকুর রহমান মুহিবের এই নামে যতটুকু বিরক্ত হওয়া সম্ভব ততটুকু বিরক্ত হলেন। তাঁর সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে আনুষ্ঠানিক। কাজেই তিনি মুহিবকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। বরফ-শীতল গলায় বললেন, আমি আমার মেয়ের নাম রেখেছি 'সারা'। তুমি এই নামেই তাকে ডাকবে।

'জ্বি আচ্ছা দুলাভাই।'

'দিনের মধ্যে তুমি লক্ষবার প্রিয়দর্শিনী বলে ডাক যা আমাকে যথেষ্ট পরিমানে বিরক্ত করে। বুঝতে পারছ ?'

'পারছি। আপনার সামনে আর ডাকব না।'

'আমার আড়ালেও এই নামে ডাকবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এটা বলার জন্যেই আমি তোমাকে খবর দিয়েছিলাম। এখন যাও। কফি খেয়ে যাও, কফি দিতে বলেছি।'

শফিকবুর রহমান সাহেবের কঠিন শাসনে মুহিবের কিছু হল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে সে এক লক্ষ বারের জায়গায় দু'লক্ষ বার ডাকতে লাগল - প্রিয়দর্শিনী। প্রিয়দর্শিনী।

জেবাও এই নাম মাঝে মাঝে বলতো, যেমন - এই মুহিব, শোন্, তোর প্রিয়দর্শিনী আজ কি করেছে, সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেয়নি। আমার চোখের পাতা এক হতেই ওঁয়া ওঁয়া করে

কান্না। আমি চোখ মেলতেই তার কান্না বন্ধ। মুখে হাসি। এইভাবে রাত জাগলে তো আমি মরে যাব। কবে তোর প্রিয়দর্শিনী বড় হবে ?

প্রিয়দর্শিনী বড় হয়েছে। এখন তার বয়স দশ। সে গোলাপী রঙের একটা স্কার্ট পরে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা শুধু যে বাবার মত দেখতে তাই না স্বভাবও বাবার মত। খুবই গম্ভীর। প্রায় ঘণ্টাদুই-এর মত সে দাঁড়িয়ে আছে। এই দু'ঘণ্টায় সে একটি মাত্র প্রশ্ন করেছে। সেই প্রশ্নের সঙ্গে হাসপাতালের বা বর্তমান পরিস্থিতির কোন সম্পর্ক নেই। সে জানতে চেয়েছে - ক্রিসেনথিমাম বানান কি ?

শফিকুর রহমান বিস্মিত হয়ে ফুলের বানান বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন - হঠাৎ এই বানানটা কেন মা ?

সারা বাবার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে বের হয়ে জেবা তাঁর কন্যাকে বললেন, আমরা এখন বাসায় চলে যাব। তুমি থাকবে তোমার বাবার সঙ্গে। আমি আবার ফিরে আসব। তোমার মামার অবস্থা ভাল না। তুমি কি বাসায় যাবার আগে তোমার মামাকে একবার দেখতে চাও ?

সারা বলল, না।

জেবা শান্ত গলায় বলল, যে মানুষটা তোমাকে এত আদর করতো একবার তুমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে না ?

'না।'

'আচ্ছা চল।'

মুহিবের বন্ধুরা জেবার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথা জেবার নেই। তাছাড়া তারা সান্ত্বনা পেতেও চাচ্ছে না। দুঃখই পেতে চাচ্ছে। জেবা বজলুর কাছে গিয়ে বলল, এখন তো আমাদের আর কিছু করার নেই। বাসায় চলে যাও, বিশ্রাম কর।

বজলু বলল, আমি এখানেই আছি। আমরা সবাই থাকব।

জেবা খানিক্ষণ ইতস্তত করে বলল, ঐ মেয়েটিকে কি খবর দিয়েছ, 'অরু' ?

'তাঁর সঙ্গে কথা হয় নি। কিন্তু বাসায় খবর দিয়েছি।'

'ও আচ্ছা। আমি চলে যাচ্ছি। সারাকে খাইয়ে আবার এসে পড়ব।'

'আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে আছেন। আমরা তো আছি। এক সেকেণ্ডের জন্য এখান থেকে নড়ব না।'

জেবা এগিয়ে যাচ্ছে। কারো কথাই সে পরিষ্কার শুনছে না, বুঝতেও পারছে না। চিৎকার করে কাঁদা দরকার। কাঁদতে পারছে না। কান্না আসছে না।

শফিকুর রহমান গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, তোমার রেস্ট দরকার। যা ইনএভিটেবল তার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হবার প্রয়োজনেই রেস্ট দরকার। বাসায় গিয়ে একটা হট শাওয়ার নাও। সামান্য কিছু হলেও মুখে দাও। তারপর দু'টো সিডাকসিন খেয়ে ঘণ্টা দু'একের জন্যে রেস্ট নাও।

জেবা কিছু বলল না। সীটে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। পেট্রোলের গন্ধে তার শরীর গুলাচ্ছে। ভয়ংকর খারাপ লাগছে।

শফিকুর রহমান বললেন, এরকম করছ কেন ? খারাপ লাগচে ?

জেবা বলল, না খারাপ লাগছে না।

'তুমি খুব শক্ত ভঙ্গিতে সিচুয়েশন হ্যাণ্ডল করছ। আমি ইমপ্রেসড। আমি ভেবেছিলাম, ভেঙ্গে পড়বে, হৈচৈ কান্নাকাটি ...।'

জেবা বলল, হৈচৈ কি কখনো করেছি ?

শফিকুর রহমান চুপ করে গেলেন। জেবা যে স্বরে কথা বলল সেই স্বর তাঁর কানে অন্যরকম শুনাল। যেন সে কথা বলছে পর্দার আড়াল থেকে।

জেবা বাড়ি পৌঁছেই সারাকে গরম পানিতে গোসল করাল। অনেকক্ষণ হাসপাতালে কাটানো হয়েছে - পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। কাজের মেয়েকে খাবার টেবিল সাজাতে বলে সে স্টাডি রুমে ঢুকল। তেমন কোন কাজকর্ম না থাকলে শফিকুর রহমান এই রুমে ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করেন। জেবা বলল, তোমার গোসল হয়েছে ?

শফিকুর রহমান বললেন, হ্যাঁ।

'মেয়েকে নিয়ে খেতে বসে যাও। রাত ন'টার মত বাজে। সারার ক্ষিধে পেয়েছে। বিকেলে নাস্তা করে নি।'

'তুমি খাবে না।'

'আমার দেরি হবে।'

'দেরি হবে কেন ? আমাদের যেমন ক্ষিধে পেয়েছে তোমারও নিশ্চয়ই পেয়েছে।'

জেবা শফিকুর রহমানের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, তোমার যেমন ক্ষিধে পেয়েছে আমার তেমন পায়নি। আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কে জানে হয়ত ইতিমধ্যে মারাও গেছে।

শফিক সাহেব নিজেকে সামলে নিলেন। এইভাবে তিনি চিন্তা করেননি। তিনি নরম গলায় বললেন, তুমি বিরাট ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ তা তো বটেই। ক্রাইসিস ফেস করতে হবে। তার জন্যে শারিরীক শক্তি দরকার। হাসপাতালে যাবে, রাত জাগবে - এই জন্যেই বলছিলাম। এসো খেতে এসো।

'চল।'

জেবা শান্ত ভঙ্গিতে খাওয়া শেষ করল। শফিক সাহেব চাপিলা মাছের ঝাল তরকারির বেশ প্রশংসা করলেন। খাবার শেষে আর সব দিনের মত তাঁকে দুধ চিনি ছাড়া চা দেয়া হল।

চায়ের কাপ নিয়ে তিনি স্টাডি রুমে চলে গেলেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফীতে তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের ঘর নিয়ে মজার একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। চা খাবার জন্যে জেবার তৈরি হতে সময় লাগবে। সারাকে ঘুম পাড়াতে হবে। আজ যে ধকল গিয়েছে জেবা চট করে ঘুমুবে বলেও মনে হয় না।

শফিক সাহেব ঠিক করলেন তিনি নিজেই জেবাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন। খানিকক্ষণ থাকবেন খোঁজ-খবর নেবেন। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলবেন। যে দু'জনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁরা রাতের মধ্যে কিছু ঘটে যাবে তা ভাবছেন না। পরিস্থিতি খারাপ হলে তিনি সারারাতই থাকবেন। জেবা খুশি হবে। সে এতটা নিশ্চয়ই আশা করছে না। দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর থেকে তিনি যা করেছেন তাতে জেবার খুশি হওয়া উচিত। খবর পাওয়া মাত্র হাসপাতালে ছুটে এসেছেন। ওষুধপত্র, রক্ত সব ব্যাবস্থা করা হয়েছে। তার ছেলেবেলার বন্ধু ডাঃ রহমতুল্লাহকে নিয়ে এসেছেন। জেবার সামনে ডাঃ রহমতুল্লাহকে বলেছেন প্রয়োজনে তিনি মুহিবকে ব্যাংকক পাঠাতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর দিক থেকে আন্তরিকতার কোন অভাব তিনি নিজে বোধ করছেন না। অবশ্যই তাঁর মধ্যে এক ধরনের ফর্মাল ভাব আছে। দুঃখে কাতর হওয়ার ভঙ্গি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। এই জিনিস তাঁর চরিত্রে নেই। অভিনয় তাঁর আসে না। অবশ্যই তিনি দুঃখিত হয়েছেন। মর্মান্তিক ব্যাপারতো বটেই ...

চা শেষ করে শফিক সাহেব কাপড় পড়ে তৈরি হলেন। তাঁর ঠাণ্ডার ধাত। প্রচুর শীত পড়েছে। মাফলার দিয়ে গলা ঢেকে যাওয়া উচিত, কিন্তু এই গ্রাম্য পোশাকটি তাঁর খুব অপছন্দের। তিনি জেবাকে বললেন মাফলার বের করে দিতে।

জেবা মাফলার হাতে স্টাডি রুমে ঢুকে বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

'তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। খোঁজ নিয়ে আসি।'

'কেন ?'

শফিক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন মানে ?

'অপ্রয়োজনে কোন কাজ তো কর না। এই কাজটা তোমার জন্যে অপ্রয়োজনীয়। কেন করতে চাচ্ছ ? আমাকে খুশি করবার জন্যে ?'

শফিক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি ঝগড়ার একটা ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছ ?

'না ঝগড়ার কোন ইস্যু আমি তৈরি করছি না। কখনোই তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিনি।'

শফিক সাহেব শীতল গলায় বললেন, সমস্ত দিনের উত্তেজনায় তোমার সিস্টেমে খানিকটা উলট-পালট হয়েছে। নয়ত এই অবস্থায় ঝগড়াটে মেয়ের মত কথা বলতে না। আমার উপদেশ শোন, চল যাই খোঁজ নিয়ে আসি। তুমি যদি চাও না হয় রাতে আমি তোমার সঙ্গে থেকে যাব। মুহিবের জন্য যে ঘর নেওয়া হয়েছে ঐ ঘর তো খালিই আছে - আমি সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। আমার শরীর ভাল না। বিশ্রাম দরকার।

'তুমি তোমার নিজের ঘরেই বিশ্রাম নাও। আমাকে খুশি করবার জন্যে তোমাকে কিছুই করতে হবে না।'

'তোমাকে খুশি করবার জন্যে আমি কিছু করছি না। আমি যা করছি দায়িত্ববোধ থেকে করছি।'

জেবা কঠিন গলায় বললেন, দায়িত্ববোধ ? কিসের দায়িত্ববোধ ?

'তুমি দেখি সত্যি সত্যি ঝগড়া শুরু করেছ। স্টপ ইট।'

জেবা বলল, চেঁচিও না। এবং চোখ রাঙিও না। উনিশ বছর ধরে তোমার চোখ রাঙানো দেখছি। আর দেখব না।

‘আর দেখব না মানে ? কি বলতে চাচ্ছ তুমি ?‘

‘বোস, চেয়ারে শান্ত হয়ে বোস। আমি কি বলতে চাচ্ছি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। কারণ আমার ধারণা তোমার বুদ্ধিবৃত্তি খুব উঁচু পর্যায়ের না। উঁচু পর্যায়ের হলে বিয়ের প্রথম বছরেই বুঝতে পারতে মানুষ নর্দমার কৃমিকে যেমন ঘৃণা করে তোমাকেও আমি ঠিক সেই পরিমাণ ঘৃণা করি।‘

শফিকুর রহমান হতভম্ব হয়ে গেলেন। জেবার আচার-আচরণ হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রুগীর মত। এ যুক্তি শুনবে না। যুক্তি শোনার মত মানসিক অবস্থা তার নেই। শফিকুর রহমান নিজেকে সংযত করে বললেন, শোন জেবা, তুমি দয়া করে দশ মিলিগ্রাম সিডাকসিন খেয়ে নিজেকে শান্ত কর। আমি বুঝতে পারছি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সামনে এসে তুমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছ। এটা অস্বাভাবিক না। স্বাভাবিক।

‘আমি নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রন হারাইনি। তবে তুমি নিয়ন্ত্রণ হারাবে। এখন যেসব কথা আমি তোমাকে বলব তা শুনেই নিয়ন্ত্রণ হারাবে। চিৎকার, চেঁচামেচি তুমি কিছুই করবে না। কারণ তুমি নিতান্তই ভদ্রলোক। তবে আমার কথাবার্তা শুনে তোমার ছোটখাট স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। তুমি বরং বিশ মিলিগ্রাম সিডাকসিন খেয়ে আমার সামনে বস। প্রেসারের ওষুধটাও খাও, প্রেসারও বেড়ে যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, দামী স্যুটটা গা থেকে খোল। আমার কথাবার্তা শেষ হবার পর আমি তোমার গায়ে থুথু ফেলব। স্যুট নষ্ট হবে।

শফিকুর রহমান বিচলিত বোধ করলেন। জেবার চোখ লাল। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। চুলগুলিওকি আজ অন্য রকম করে বেঁধেছে ? এত বছরের চেনা মানুষতো এ নয়। এ অন্য কেউ। অন্য কোন জেবা। তিনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন। আগে কখনো সিগারেটের তৃষ্ণা বোধ করেননি। আজ করছেন।

জেবা শাড়ির আঁচল গায়ে তুলে দিল। চেয়ারের হাতল থেকে হাত তুলে নিয়ে কোলের উপর রাখল। সে তাকিয়ে আছে শফিকের দিকে। তার দৃষ্টি তীব্র, চোখের মণি ছোট হয়ে আছে। উজ্জ্বল আলোর দিকে মানুষ যেমন ভুরু কুঁচকে তাকায় তেমনি করে সে তাকিয়ে আছে। জেবা বলল, আমার পরম দুর্ভাগ্য যে আমি রূপবতী হয়ে জন্মেছিলাম। এমন রূপবতী যে স্কুলে পড়ার সময়ই আমার নামডাক ছড়িয়ে গেল। তোমরা কৌতুহলী হয়ে আমাকে দেখতে এলে। আমাকে দেখে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলে। এমন সুন্দর একটা মেয়েকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে

করে না। আবার বাপ-মা মরা হাভাতে একটা মেয়েকে গ্রহণ করতেও ইচ্ছে করে না। মহা সমস্যা। মনে আছে ?

‘এখন এই প্রলাপের মানে কি ?‘

‘মানে আছে। প্রলাপগুলি মন দিয়ে শোন - তোমরা সুন্দরী মেয়ের লোভ সামলাতে পারলে না। আমাকে বউ হিসেবে ঘরে নেওয়া সাব্যস্ত করলে। বড় মামার বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আমার সোজা সরল মামার ধারণা হল - আমার বাবা-মা‘র পরম পুণ্যে এমন একটা বিয়ের সম্বন্ধ হল। আমি মুহিবকে নিয়ে তোমার প্রকাণ্ড বাড়িতে চলে এলাম। এটি তোমার পছন্দ হল না। মুহিবকে মামার বাড়িতে রেখে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওর বয়স মাত্র পাঁচ। ওকে বড় করেছি আমি। আমাকে না দেখে সে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না। বিকেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যখন খেলতে যেত কিছুক্ষণ পর পর সে ছুটে এসে দেখে যেত আমি বাসায় আছি কি-না। এই পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চা ছেলের উপর তুমি কি রকম মানসিক চাপ দিয়েছিলে তোমার মনে আছে ?‘

শফিক কঠিন গলায় বলল, তুমি সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছ। জেবা বলল, গত উনিশ বছর তুমি একা সীমা অতিক্রম করেছ। আজ আমি করব। -মনে আছে কিভাবে তুমি বাচ্চা একটা ছেলেকে শাস্তি দিতে ? তোমাদের বিরাট বাড়ি। তাকে একা একটা ঘরে থাকতে দিলে। সে ভয়ে অস্থির। আমি বললাম, কাজের একটা মানুষ তার ঘরে শুয়ে থাক। তুমি বললে, কাজের মানুষদের দোতালায় উঠার নিয়ম নেই। প্রথম রাতে মুহিব ভয় পেয়ে আমাদের শোবার ঘরে দরজার সামনে এসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তুমি তাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিলে। মনে আছে ?

‘হ্যাঁ মনে আছে। আমি সেটাকে বড় অপরাধ বলে মনে করিনি। আমাদের এই বাড়ি ভুতের বাড়ি নয়। ভয় কাটানোর জন্যে সামান্য শাসন অন্যায় না।‘

‘এটাবে তুমি সামান্য শাসন বলছ ? রাতের পর রাত তাকে তালাবদ্ধ রাখা সামান্য শাসন ?‘

‘তোমার কথা শেষ হয়েছে না আরো আছে ?‘

‘এত চট করে আমার কথা শেষ হবার না। আমাকে মুহিবের কাছে যেতে হবে। কাজেই অল্পতেই শেষ করব। আমার যে দরিদ্র বড় মামার কাছ থেকে তুমি আমাকে তুলে এনেছিলে সেই বেচারা কোন দোষ করেনি। কিন্তু কি অপমান তুমি তাকে করেছ, তা-কি মনে আছে ?‘

'না মনে নেই। আমার স্মৃতিশক্তি তোমার মত প্রখর না।'

'তাহলে মনে করিয়ে দেই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব আগ্রহ করে মামা একদিন আমাকে দেখতে এলেন। তুমি এমন ভঙ্গি করলে যে এ কি যন্ত্রনা ! মামা সোজা মানুষ তোমার এই ভঙ্গি ধরতে পারলেন না। মহানন্দে তিনি বাড়িঘর দেখতে লাগলেন। আনন্দে এবং বিস্ময়ে তিনি অভিভূত। বার বার বলছেন - "আমার জেবা মা'র রাজকপাল।" আমি জানি আমার "কি কপাল"। তবু মামার আনন্দ দেখে আমারো আনন্দ হল। তাঁরা যখন চলে গেলেন তুমি আমাকে এসে বললে, আমার রোলেক্স ঘড়িটা পাচ্ছি না। ড্রেসিং টেবিলের উপর ছিল। তুমি শুনলে আহত হতে পার। তবু বলছি, আমি নিশ্চিত তোমাদের বাড়ির কেউ কাণ্ডটা করেছে। আমি খোঁজ নেবার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।

মানুষ হিসেবে তোমার প্রতি আমার উঁচু ধারণা কখনোই ছিল না। তবুও এ-ধরনের চিন্তা তুমি করতে পার, তা ভাবিনি। আমি পাথর হয়ে গেলাম। একবার ভাবলাম তোমার পা জড়িয়ে ধরে বলি - এটা করো না। এই দয়াটা তুমি আমার প্রতি করো। শেষ পর্যন্ত তাও করা হল না। পা জড়িয়ে ধরতে ঘৃণা বোধ হল। তুমি চিঠি দিয়ে মামার কাছে লোক পাঠালে। মামা ছুঁটে এলেন এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মনে আছে ?'

'ঘড়ি বিষয়ে খোঁজ নেয়া কি খুব অযৌক্তিক ছিল ? অলগোল্ড রোলেক্স ঘড়ি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম। তার চেয়ে বড় কথা এটা আমার দাদার দেয়া গিফট্, স্মৃতিচিহ্ন। আমি খোঁজ করব না ? এতগুলি মানুষ ঐদিন এ-বাড়িতে এসেছে। দরিদ্র মানুষ। অভাবের তাড়নায় দরিদ্র মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তাদের পক্ষে ঘড়ি নিয়ে যাওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক ? আমি তো মনে করি, আমি ঐদিন যা করেছিলাম ঠিকই করেছিলাম। অযৌক্তিক কিছু করিনি।'

'তোমার সব কাজই যৌক্তিক। চমৎকার একজন যুক্তিবাদী মানুষ তুমি। উনিশ বছর ধরে তোমার যুক্তি শুনছি আর মুগ্ধ হচ্ছি। আর ইচ্ছা করছে না। এই যে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। এ-বাড়ি থেকে এটাই আমার বের হয়ে যাওয়া। আমি আর ফিরে আসব না।'

'কি বললে ?'

'যা বলেছি তুমি ভালমতই শুনেছ। তারপরেও যদি শুনতে চাও আবার বলতে পারি। শুনতে চাও ?'

'তোমার মেয়ে ?'

'এই মেয়ে আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি তোমার মত করেই ওকে মানুষ কর। এর জন্ম আমাদের দুজনের ভালোবাসায় হয়নি। এর প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।'

'তুমি যেসব কথা বললে, তার জন্যে তোমার অনুতাপের কোন সীমা থাকবে না।'

'না থাকলে কি আর করা। অনুতাপ করব। তবে তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে থেকে করব। তোমার মুখ দেখতে হচ্ছে না এই আনন্দ অনুতাপের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি হবে। এই কথাটি সত্যি।'

জেবা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, তুমি হয়ত জান না, বুধবারে মুহিব গোপনে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। বিয়েটা তাকে গোপনে করতে হয়েছে। আমাকেও সে জানায়নি কারণ তুমি। তার জীবনের চরম আনন্দের ঘটনায় আমি পাশে ছিলাম না। তার কারণও হচ্ছ তুমি। বেচারা ভয়ে আমাকে পর্যন্ত বলতে পারেনি। আমাকে বললে যদি তুমি শুনে ফেল। তোমার কাছ থেকে শেষ একটা সুবিধা নেই। তুমি কি তোমার ড্রাইভারকে বলে দেবে যেন আমাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আসে ? আমি বললে তো হবে না। ড্রাইভারকে তুমি বলে রেখেছ গাড়ি বের করতে হলে সব সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে। ঠিক না ?'

শফিকুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। জেবা বলল, সব মন্দ দিকেরও একটা ভাল দিক থাকে। মুহিবের জীবন সংশয় না হলে আজ যেভাবে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারছি তা পারতাম না। সারা জীবন থাকতে হত তোমার সঙ্গে।

জেবা থু করে কার্পেটে থু থু ফেলল।

'তুমি অসম্ভব উত্তেজিত। উত্তেজিত অবস্থায় তুমি কি বলছ নিজেও জান না।'

'আমি কি বলছি আমি খুব ভাল জানি। এখন তোমাকে যা বললাম তার প্রতিটি শব্দ আমি মনে মনে লক্ষবার করে বলেছি।'

'আমার সম্পর্কে বলা যায় এমন ভাল কিছু কি নেই ?'

'আছে, একটা আছে। বিয়ের পর তুমি আমাকে পড়াশোনা করিয়েছ। ইংরেজী সাহিত্যে আমি এম.এ. পাশ করেছি, তোমার জন্যেই করেছি। সংসারে ছেলেমেয়ে এলে পড়াশোনায় ক্ষতি হবে, কাজেই আমাদের মেয়ে সারার জন্ম হল বিয়ের ন'বছর পর। খুব সাবধানে এই সব বিষয়ও তুমি লক্ষ্য করেছ। ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছ। গায়িকা হিসেবে আমি মোটামুটি ধরনের। সেই গায়িকাকে আজ যে লোকে চেনে, উৎসাহী বালিকারা যে অটোগ্রাফ চায় তার

কারণ তুমি বিস্তর ধরাধরি করে আমাকে রেডিও, টিভিতে সুযোগ করে দিয়েছ। এটা অবশ্যই তোমার ভাল দিক। এই ভাল দিকেও কিন্তু ফাঁকি আছে। তুমি যা করেছ তা আমার জন্য করনি, তোমার নিজের জন্যে করেছ। লোকে বলবে তোমার স্ত্রী এম.এ. পাশ, লোকে বলবে তোমার স্ত্রী বিখ্যাত গায়িকা ... ভুল বললাম ?'

শফিকুর রহমান জবাব দিলেন না। জেবার ঠোঁট হাসির ভঙ্গিমায় একটু উল্টে গেল। সে তার গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বলল, তুমি কি তোমার বিখ্যাত গায়িকা স্ত্রীর গান কখনো শুনতে চেয়েছ ? বর্ষার রাতে কখনো কি তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে বলেছ - "আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে" এই গানটা একটু গাও তো শুনি ?

'সবার সব বিষয়ে উৎসাহ থাকে না।'

'ঠিক বলেছ। সবার সব বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। তোমার একটি বিষয়েই উৎসাহ - স্ত্রীকে নগ্ন করে তার দিকে তাকিয়ে থাকা।'

'স্টপ ইট।'

'চেঁচিও না। চেঁচিয়ে কিছু হবে না।'

জেবা আবার কার্পেটে থুথু ফেলল। পাশের ঘরে সারা কাঁদছে। সে হয়ত বাবা-মা'র চিৎকার বা হৈচৈ শুনেছে। কিংবা কোন কারণে তার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেছে। দশ বছর বয়স হলেও এই মেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে খানিকক্ষণ কাঁদে। অন্য সময় হলে জেবা ছুটে যেত। আজ গেল না। কালো হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে নিতে নিতে বলল, মেয়ের কাছে যাও। আমি বিদায় হচ্ছি। গাড়ি নেব না। এমন কিছু রাত হয়নি। আমি একটা রিকশা নিয়ে চলে যাব।

অনেকক্ষণ দরজা নক করার পর সারা দরজা খুলল। শফিক সাহেব বললেন, কাঁদছ কেন মা ?

সারা চোখ মুছতে মুছতে বলল, মামার জন্য খুব খারাপ লাগছে।

'খারাপ লাগাইতো স্বাভাবিক। কাঁদলে কি খারাপ লাগা দূর হবে ?'

'কান্না এলে আমি কি করব ?'

'নিজেকে সামলাতে হবে। যাও, বাথরুমে যাও, হাত মুখ ধুয়ে আস।'

'বাবা, আমি মামার কাছে যেতে চাই।'

'কি হবে সেখানে গিয়ে ? তুমি তো ডাক্তার না। তুমি কোনভাবেই তাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

'সাহায্য করার জন্য তো আমি যেতে চাচ্ছি না।'

'তাহলে কি জন্যে যেতে চাও ?'

'আমি মামার বন্ধুদের মত ক্লিনিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব। আমার যদি কাঁদতে ইচ্ছে করে, আমি কাঁদব। মামার যে বন্ধুটা চিৎকার করে কাঁদছিল আমি সে-রকম চিৎকার করে কাঁদব।'

'সারা, মা তুমি বোকা মেয়ের মত কথা বলছ।'

'আমাকে সারা ডাকবে না বাবা। এই নাম আমার ভাল লাগে না। আমাকে প্রিয়দর্শিনী ডাকবে।'

'কে তোমাকে এসব বলতে শিখিয়েছে ? তোমার মা ?'

'যা শেখার আমি নিজে নিজে শিখি। কারো কাছ থেকে আমি কিছু শিখি না।'

কোনদিন শফিকুর রহমান যা করেন না আজ তাই করলেন। মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। প্রিয়দর্শিনী কার্পেটে ছিটকে পড়ল তবে কেঁদে উঠল না। অদ্ভূত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল বাবার দিকে।

॥ ৯ ॥

মুহিবের সব বন্ধুরাই এখনো আছে। চারজন ছিল, তার সঙ্গে আরো দুজন যুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের নাম তোফাজ্জল। সে হাসপাতালের ডাক্তারদের বড় বিরক্ত করছে। দশ মিনিট পর পর হাত কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করছে, স্যার অবস্থা কি রকম দেখছেন ? ইমপ্রুভমেন্ট বোঝা যায় ? ব্লাড লাগবে কি-না একটু কাইণ্ডলি বলবেন ? আমার আর মুহিবের সেম ব্লাড গ্রুপ - বি পজেটিভ।

শুরুতে ডাক্তাররা তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। এখন দিচ্ছেন না। তাকে দেখামাত্র বিরক্ত হচ্ছেন। তোফাজ্জল এইসব বিরক্তি গায়ে মাখছে না। সে যে শুধু ডাক্তারদের বিরক্ত করছে তাই না, নার্সদেরও বিরক্ত করছে। বিশেষ করে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের নার্সদের। দরজায় টোকা দিয়ে বলছে - সিস্টার, একটু বাইরে আসবেন ? জাস্ট ফর এ সেকেণ্ড। রুগীর অবস্থাটা একটু বলবেন ? খুব টেনশান ফিল করছি। অবস্থা স্টেবল কি-না বলুন। ব্লাড লাগলে জানিয়ে দিলেই হবে। আমারো বি পজেটিভ। আপা কি মনে করেন, অবস্থাটা এখন ভালর দিকে না ?

মুহিবের অবস্থা ভালর দিকে নয়। জ্ঞান এখনো আসেনি। সে আছে কোমার ভেতর। হার্টবিট নেমে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা বিট মিস করা শুরু করেছে। পায়ের পাতা হয়েছে হালকা নীল যার মানে ফুসফুস রক্ত তেমনভাবে পরিষ্কার করতে পারছে না। রক্তে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে অক্সিজেন দিয়েও সেই ঘাটতি পুরণ হচ্ছে না। রিফ্লেক্স এ্যাকশান সর্ব নিম্ন পর্যায়ে। চোখের মণিতে কড়া আলো ফেলার পরও মণি তেমনভাবে সংকুচিত হচ্ছে না।

রাত দশটায় রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান তোফাজ্জলকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, রুগীর অবস্থা ভাল না।

তোফাজ্জল ক্ষীণ স্বরে বলল, একটু আগে একজন সিস্টার বললেন অবস্থা স্টেবল।

'এখনো স্টেবল। স্টেবল মানেই ভাল তা তো না। অবস্থা খারাপ হওয়া শুরু করেছে।'

'ও।'

'আমাদের তেমন কিছু করণীয় নেই।'

'স্যার, পিজিতে কি ট্রান্সফার করব ?'

‘তাতে কোন উনিশ-বিশ হবে বলে মনে হয় না। পিজিতে যেসব ফেসিলিটি আছে আমাদেরও আছে। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না। একমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই। অপেক্ষা করুন এবং প্রার্থনা করুন।‘

‘ব্লাড কি লাগবে স্যার ?‘

‘একটু পর পর ব্লাডের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? লাগলে আপনাদের জানাতাম। রুগী আপনার কে হয় ?‘

‘ভেরী ক্লোজ ফ্রেণ্ড স্যার।‘

বলতে বলতে তোফাজ্জল কেঁদে ফেলল। মুহিব তার বিয়ের সময় তাকে খবর দেয় নি। এই দুঃখেও সে একবার কেঁদেছে। এখন কাঁদছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দুঃখে। বছর তিনেক আগে তোফাজ্জলের আলসার অপারেশন হল। দু‘ ব্যাগ রক্ত লেগেছিল। সেই দু‘ ব্যাগ রক্ত মুহিব দিয়েছে। রক্তের ঋণ শোধ হয় নি।

ডাক্তার সাহের অস্বাভাবিক কোমল গলায় বললেন, ভাই কাঁদবেন না। আপনি রুগীর আত্মীয় স্বজন সবাইকে খবর দিন। খুব খারাপ কিছুর জন্যে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বলুন। আরেকটা কথা - আপনি ইনটেনসিভ ইউনিটের নার্সদের আর বিরক্ত করবেন না। প্লীজ। ওরা আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করেছে।

‘স্যার, আমি আর বিরক্ত করব না।‘

তোফাজ্জল ডাক্তারের ঘর থেকে বের হয়ে এল চোখ মুছতে মুছতে। তার বন্ধুরা তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। সেও কিছু বলল না। শুধু যখন জেবা এসে বারান্দায় দাঁড়াল তখন সে বলল, আপা, ডাক্তার সাহেব বললেন মুহিবের অবস্থা ভাল না। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিতে বললেন।

জেবা ক্লান্ত গলায় বলল, খবর দেয়ার আর কেউ নেই। ঐ মেয়েটা কি এসেছিল, অরু ?

‘জ্বি-না।‘

‘ওর বাসার ঠিকানা কি তোমরা কেউ জান ? আমি মেয়েটিকে নিয়ে আসব।‘

॥ ১০ ॥

রাহেলা বললেন, রাত তো অনেক হয়েছে, দশটা প্রায় বাজে খেয়ে যাও না। আবরার লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জ্বি না। এখন উঠব। অনেক দেরি করে ফেললাম।

অরু বলল, উঠব বলে তো বসেই আছেন। উঠছেন তো না।

মীরু তাকাল শাসনের ভঙ্গিতে। চোখের ভাষায় বলার চেষ্টা - এসব কি হচ্ছে ?

রাহেলা বললেন, বাবা তুমি পা তুলে আরাম করে বস। ঘরে যা আছে তাই খাবে। আমি খাবার দিতে বলে আসি।

মীরু বলল, আমরা কিন্তু খুব ঝাল খাই। আপনি ঝাল খেতে পারবেন তো ?

'চেষ্টা করে দেখি।'

'আবীরের বাবা আবার একদম ঝাল খেতে পারে না। কাঁচা মরিচ কিনতে গিয়ে দোকানদারকে কি বলে জানেন ? বলে - এই যে ভাই, ঝাল নেই এমন কাঁচা মরিচ আছে ?'

'উনি আছেন কেমন ?'

'ভাল আছে। আজই কথা বললাম। অবশ্যি খুব ভাল বোধহয় নেই। আমার কাছে তার গলার স্বর একটু ভারি ভারি লাগল। মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। ঠাণ্ডা লাগলে গলার স্বর ভারি হয়ে যায় না ?'

আবরার হাসিমুখে বলল, ডাক্তারী শাস্ত্রে এমন কথা পড়ি নি। তবে হতে পারে।

'জানেন মাঝে মাঝে ওর গলা আমি একদম চিনতে পারি না। একদিন কি হয়েছে জানেন, সে অফিস থেকে টেলিফোন করে আমাকে বলল, মীরু, কেউ কি আমার খোঁজ করেছিল ? আমি একদম গলা চিনতে পারলাম না। আমি বললাম, কে ? কে কথা বলছেন ? ইন্টারেস্টিং না?'

'ইন্টারেস্টিং তো বটেই।'

মীরু আরেকটা গল্প শুরু করতে যাচ্ছিল। রাহেলা তাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, তোর কি বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারেই নেই ? ওকে অরুর সঙ্গে গল্প করতে দে। ও অরুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। তোর বকবকানি শোনার জন্যে আসে নি। তখন থেকে আঠার মত লেগে আছিস।

মীরু আহত গলায় বলল, আঠার মত কখন লেগে রইলাম ? বাবুর শরীর খারাপ। বাবুকে দেখাচ্ছিলাম।

'দেখানো তো হয়েছে। এখন চুপচাপ আমার সামনে বস।'

মীরু গম্ভীর মুখে বসল। তার মনটা খারাপ। আবীরের বাবা প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে হয়েছিল। গল্পটা বলা গেল না। খাবার টেবিলেও বলা যাবে না। বাবাও নিশ্চয়ই একসঙ্গে খেতে বসবেন। এইসব হালকা ধরনের গল্প বাবার সঙ্গে করা যায় না।

রাহেলা চাকচাক করে আলু কাটছেন। ঘরে খাবার তেমন কিছু নেই। আলু ভাজি করে দেবেন। একটা পদ বাড়বে। দুপুরের মাছ আছে, রাতে ডিমের তরকারী করা হয়েছে। মাছ, ডিমের তরকারী, আলুভাজা। ডাল রান্না হয়নি। অনেকে আবার ডাল ছাড়া খেতে পারে না। একটু ডাল কি বসিয়ে দেবেন ? আধ ঘণ্টার মত লাগবে। আচ্ছা লাগুক। এক রাতে একটু দেরি করে খেলে কিছু হবে না। মীরু কেমন মুখ কালো করে বসে আছে। রাহেলার মায়া লাগল, তিনি কোমল গলায় ডাকলেন, মীরু ?

'কি ?'

'মুখ কালো করে বসে আছিস কেন ? তুই কি রাগ করেছিস আমার কথায় ?'

'না।'

'আচ্ছা তোর কাছে আবরার ছেলেটাকে কেমন লাগে ?'

'ভাল।'

'কি রকম ভাল ?'

'বেশ ভাল। ভদ্র। চেহারাও সুন্দর। অবশ্যি গায়ের রঙ শ্যামলা ধরনের। আবীরের বাবার পাশে দাঁড়ালে বেচারাকে রীতিমত কালো লাগবে। আমেরিকায় থেকে এখন নিশ্চয়ই আরো ফর্সা হয়েছে।'

রাহেলা বিরক্ত মুখে বললেন, ফর্সা হবারই কথা।

'তুমি তোমার দুই জামাইয়ের মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ কর মা ?'

'দ্বিতীয় জন জামাই এখনো হয়নি। হোক, তারপর দেখা যাবে।'

'ধর হয়েছে। হতে বাকিও বেশি নেই।'

'বড় জামাইকেই বেশি পছন্দ করব। বড়র মর্যাদাই আলাদা।'

'তোমার বড় জামাই তোমাকে খুব পছন্দ করে। প্রতি চিঠিতে তোমার কথা থাকে। লাস্ট চিঠিতে লিখল - মা'র শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবে। ব্লাড প্রেসার এই বয়সে কন্ট্রোলে রাখতে হয়। তুমি খুব খেয়াল রাখবে। মা বুড়ো মানুষ - ওষুধ খাবার কথা হয়ত মনেই থাকবে না ...'

রাহেলা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই কি চিঠি মুখস্থ করে ফেলেছিস না-কি ?

মীরু লাজুক গলায় বলল, অনেকবার করে পড়ি তো। মুখস্থ হয়ে যায়। এই যে ওর চিঠিটা তোমাকে পড়ে শুনালাম এর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ্য করেছ ?

'না।'

'ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সব জামাইরা শাশুড়িকে আম্মা ডাকে। ও কিন্তু তোমাকে 'মা' ডাকে। মা ডাকটা অনেক আন্তরিক না ?'

রাহেলা কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। তাঁর দাঁতব্যথা তীব্র হচ্ছে। বসে থাকতে পারছেন না।

অরু বলল, আপনি পা তুলে আরাম করে বসছেন না কেন ? পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে না ? পায়ের উপর চাদর টেনে দিন।

আবরার বলল, তোমার মা'র বিছানায় পা তুলে বসতে সংকোচ লাগছে।

'এটা মা'র বিছানা মোটেই না। এটা হচ্ছে গেস্ট বিছানা। বাবা-মা'র ঝগড়া হলে মা এখানে ঘুমুতে আসেন।'

'এখন কি উনাদের ঝগড়া চলছে ?'

'হ্যাঁ চলছে। সপ্তাহে তাঁরা আটবার ঝগড়া করেন। এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া যে মাঝে মাঝে তাঁদেরকে খুব ছেলেমানুষ মনে হয়। আজ কি নিয়ে তাঁদের ঝগড়া হয়েছে জানেন?'

'কি নিয়ে ?'

'দাঁতব্যথা নিয়ে। মার দাঁত ব্যথা করছিল। বাবা বললেন লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচা করতে। মা বললেন, এতে কিছু হয় না। বাবা রেগে গেলেন - তুমি কি করে দেখেছ যে হয় না ? না করেই বললে, হয় না। যুক্তি এবং কাউন্টার যুক্তি চলতে লাগল। এক পর্যায়ে বাবা ... থাক সেটা আর আপনাকে বলব না।'

অরু মিটিমিটি হাসতে লাগল। আবরার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। এই মেয়ের কথা বলার ভঙ্গি এত সুন্দর। চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মেয়েটা কি বলছে সেদিকে লক্ষ্য থাকে না - কি করে কথা বলছে তাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আবরার ঠিক করে রেখেছে সে বিয়ের পর অরুকে বলবে, তুমি প্রতি রাতে এক ঘণ্টা আমার সামনে বসবে এবং ননস্টপ কথা বলে যাবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে পারবে না।

'অরু।'

'জ্বি।'

'তোমরা দু'বোন সম্পূর্ণ দু'রকম। চেহারায় মিল ছাড়াও জেনেটিক কারণে বোনে বোনে কিছু মিল থাকে। তোমাদের তাও নেই।'

'মিল আছে। দু'জনের কাউকেই তো আপনি ভালমত জানেন না, তাই ধরতে পারছেন না।'

'মিলটা কি বল তো ?'

অরু শান্ত গলায় বলল, ভালবাসার ক্ষমতা আমাদের দু'বোনেরই অসাধারণ। আমরা পাগলের মত ভালবাসতে পারি। আমার দুলাভাই প্রাণী হিসেবে খুবই নিম্নশ্রেনীর। তাকে যে কি পরিমান ভাল আপা বাসে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'এটা কি ভাল ?'

'কেন ভাল না ? ভালকে তো সবাই ভালবাসে। মন্দকে ক'জন ভালবাসতে পারে ?'

আবরার আগের মত মুগ্ধ চোখে আবার তাকাল। সে ভেবে পাচ্ছে না তার এই মুগ্ধতা বিয়ের পরেও থাকবে কি-না। এই মেয়েটি খুব সহজ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে। এটিও একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। যার সঙ্গে অল্প ক'দিন পর বিয়ে হবে তার সঙ্গে এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কি কথা বলা যায় ? লজ্জা, দ্বিধা, সংকোচ খানিকটা হলেও তো আসবে। এই মেয়েটার মধ্যে তা আসছে না কেন ?'

'অরু ?'

'জ্বি।'

'প্রায় তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, মনে থাকে না।'

'এখন নিশ্চয়ই মনে পড়েছে।'

'হ্যাঁ। তুমি খুব সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বল, আমার ভাল লাগে। আমি আবার কারো সঙ্গে খুব সহজ হতে পারি না। সহজ হতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারি না। আমি যখন আমার মা'র সঙ্গে কথা বলি তখনো খানিকটা আড়াল থাকে।'

'এইতো এখন সহজভাবে কথা বলছেন। এখন কি কোন আড়াল বোধ করছেন ?'

'না করছি না।'

'তাই বলুন।'

আবরার ইতস্ততঃ করে বলল, তোমার সঙ্গে কি মুহিব নামের কোন ছেলের পরিচয় আছে ? আমার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নি দিন দশেক আগে হঠাৎ একগাদা কথা বলল ...

আবরার থেমে গেল। অরু চুপ করে আছে। তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। আবরার অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমি অবশ্যি কিছুই মনে করি না। পরিচয় থাকাটাই স্বাভাবিক। ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। মেয়েদের শুধু মেয়ে বন্ধু থাকবে ছেলে বন্ধু থাকবে না তা কি হয়?'

অরু আবরারকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ভাগ্নি ঠিকই বলেছে। মুহিব নামের একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাল পরিচয় আছে।

আবরার চুপ করে আছে। প্রসঙ্গটা তোলায় সে নিজেই বিব্রত বোধ করছে। তবে অরুর মধ্যে বিব্রত বা অস্বস্তিবোধের তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অরু বলল, আর কিছু কি জানতে চান ?

আবরার বলল, এই না না, কিছুই জানতে চাই না। যে সহপাঠি বন্ধুরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হৈচৈ করছে - বন্ধুর মত সম্পর্ক। এটা আমার কাছে খুব হেলদি বলে মনে হয়। অরু, তুমি কখনো মনে করবে না যে বিয়ের পর আমি তোমাকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বন্দি করে ফেলব। মনের এইটুকু ঔদার্য আমার আছে।

অরু বলল, আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছি।

'আবরার বিস্মিত হয়ে বলল, কি চিঠি ?'

'আমি আপনার সঙ্গে খুব সহজ ভঙ্গিতে কথা বললেও আমার এমন কিছু কথা আছে যা সহজভাবে বলতে পারছি না। এই জন্যেই চিঠি লিখেছিলাম।'

'কোথায় সেই চিঠি ?'

'চিঠিটা আমার পছন্দ হয়নি। আবার নতুন করে লিখব - আজ রাতেই লিখব। কাল আপনাকে আমি নিজের হাতে দিয়ে আসব।'

'বিষয়বস্তু কি জানতে পারি ?'

'কাল জানবেন।'

'অরু, কোন সমস্যা আছে কি ?'

অরু ক্ষীণস্বরে বলল, আছে। সমস্যা আছে। বড় রকমের সমস্যা আছে।

আবরার তাকিয়ে আছে। অরুও তাকিয়ে আছে। তবে সে তাকয়ে আছে জানালার দিকে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। বারান্দায় বাতি জ্বলছে বলেই বৃষ্টির ফোটা চোখে পড়ছে। আলো পড়ে বৃষ্টির ফোটাগুলি মুক্তার মত ঝিকমিক করছে। অরুর কান্না পাচ্ছে। কান্না আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। মীরু এসে বলল, কি ব্যাপার, দু'জন চুপচাপ কেন ? খাবার দেয়া হয়েছে।

আবরার লক্ষ্য করল, অরুর হাতে আংটি নেই। এমন কোন বড় ব্যাপার নয় তবু কেন জানি এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। হাতে আংটি নেই - অরু নিজেও কি এ-ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিচ্ছে ? হাত আড়াল করার চেষ্টা করছে কেন ?

অরু খেতে বসল না। শুকনো মুখে বলল, আমার ক্ষিধে নেই।

রাহেলা বললেন, দুপুরেও তো কিছু খাসনি। কি ব্যাপার, জ্বর না-কি ?

'না জ্বর না।'

'দেখি, কাছে আয়। আশ্চর্য ! জ্বর আছে তো ?'

অরু হাসতে হাসতে বলল, এত আশ্চর্য হবার কি আছে মা ? মানুষের জ্বর হয় না ?

'অকারণে জ্বর হবে কেন ?'

'সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ? ডাক্তার সাহেব আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস কর।'

আবরার নিঃশব্দে খাচ্ছে। মীরু তার প্লেটে খাবার উঠিয়ে দিচ্ছে। অরুদের খাবার টেবিলটা বেশ বড়। এত বড় টেবিলের এক কোণায় একজন মানুষ মাত্র খাচ্ছে। দৃশ্যটা চোখে পড়ার মত। রাহেলা বললেন, তোমাকে একা খেতে হচ্ছে। তুমি কিছু মনে করো না বাবা। অরুর বাবা এখন খাবেন না। আমাকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আর মীরু সন্ধ্যেবেলা দু'টা রুটি খায়, রাতে আর কিছু খায় না।

আবরার বলল, আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। একা খেয়ে আমার অভ্যাস আছে। বাড়িতেও আমি একা খাই।

মীরু বলল, আমি সন্ধ্যাবেলা দু'টা রুটি খাই কেন জানেন ? আবীরের বাবার জন্যে। সে চিঠিতে লিখেছে - "এ দেশের মেয়েদের বেশির ভাগ পেটুক। যা পায় গব গব করে খায়। বিয়ের পর এক একজন ফুলে কোলবালিশ হয়ে যায়। তুমি খাবার-দাবারের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। তোমার মোটার ধাত।"

অরু বলল, আপা, চুপ কর তো। পুরো চিঠি মুখস্থ বলতে হবে না। এমনিতে আপার স্মরণশক্তি খুব খারাপ কিন্তু দুলাভাইয়ের প্রতিটি চিঠি দাঁড়ি, কমা, কাটাকুটিসহ মুখস্থ।

আবরার হাসল। রাহেলাও হেসে ফেললেন। হাসি গোপন করার চেষ্টা করেও হাসি গোপন করতে পারলেন না। মীরু কঠিন গলায় বলল, স্বামীর চিঠি মুখস্থ করা কি অপরাধ ?

'না অপরাধ না। তবে সেই চিঠি কবিতার মত আবৃত্তি করে সবাইকে শুনানো একটি শাস্তি যোগ্য অপরাধ।'

মীরুর মুখ থমথম করছে। হয়ত সে কেঁদে ফেলবে। রাহেলা পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে বললেন, মীরু তুই আবরারের জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে আন। রাতে ভাত খাবার পর তুম কি চা খাও বাবা ?

'খাই না। তবে আজ খাব। বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে।'

অরু বলল, মা, আমি আর বসে থাকতে পারছি না। তুমি তোমার গেস্টকে যত্ন করে চা খাওয়াও। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। শরীর খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে খুব ভালমত জ্বর আসছে।

মুহিবের অবস্থা মনে হয় খারাপ। একজন ডাক্তার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে হঠাৎ ছুটে বের হলেন। দু'জন ডাক্তার নিয়ে ফিরলেন। জেবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করছে না।

বজলু এসে বলল, আপা ঘরে গিয়ে বসুন। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন।

জেবা একটু সরে দাঁড়াল। বৃষ্টির ছাটে শাড়ির অনেকখানি ভিজেছে, খেয়ালই হয় নি।

'শীত লাগছে আপা ?'

'একটু লাগছে। তোমার স্ত্রী কোথায় ?'

'ওকে ভাইয়ের বাসায় রেখে এসেছি। খুব কান্নাকাটি করছিল।'

'ভাল করেছ। সবাই মিলে কষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।'

'আপা, আপনি কি কিছু খেয়েছেন ?'

'না। তোমরা খেয়েছ ?'

'জ্বি। লেয়াকত টিফিন কেরিয়ারে করে বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসেছিল। এমন ক্ষিধে লেগেছিল ...'

'ক্ষিধে লাগাই স্বাভাবিক। ক্রাইসিসের সময় ক্ষিধে পায়।'

'লিয়াকত চা-ও নিয়ে এসেছে। আপনাকে একটু চা দেব আপা ?'

জেবা স্বাভাবিক গলায় বলল, দাও। বজলু খুব অবাক হচ্ছে। কি শক্ত মেয়ে। কত সহজভাবে সমস্যা গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত একবারও কাঁদেনি।

'বজলু।'

'জ্বি আপা।'

'মৃত্যু দেখে আমার অভ্যাস আছে। মা মারা গেলেন, বাবা মারা গেলেন, আমার ছোট একটা বোন ছিল রেবা, সেও মারা গেল। এরা তিনজনই সারারাত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে ভোরবেলা মারা গেল। সবার প্রথমে মারা গেলেন মা। মা'র মৃত্যুতে কেঁদেছিলাম। তারপর আর কাঁদিনি। কান্না আসেনি।'

জেবা চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে চা-টা ভাল লাগছে।

'আমার কি মনে হয় জান বজলু ? আমার মনে হয় মা-বাবা মৃত্যুর পর পরকালে একটা সংসার পেতেছেন। এক এক করে আমাদের সব ভাইবোনকে নিয়ে যাচ্ছেন। সবার আগে নিলেন রেবাকে। কারণ রেবা ছিল বাবা-মা'র খুব পছন্দের মেয়ে। এখন অপেক্ষা করছেন মুহিবের জন্যে।

'এইসব আলোচনা থাক আপা।'

'কেন ? তোমার শুনতে কি খারাপ লাগছে ? আমার বলতে কিন্তু খারাপ লাগছে না। রেবার মৃত্যুর সময় কি হল শোন - খুব কষ্ট পাচ্ছিল। রাত দু'টার সময় হঠাৎ করে যেন তার কষ্ট কমে গেল। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে লাগল। আমি তার মাথার কাছে বসে আছি। সে হঠাৎ শক্ত করে আমার দু'হাত ধরে উত্তেজিত গলায় বলল, আপা দেখ দেখ। আম্মু এসেছে। আম্মু। সে আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখাতে লাগল।'

জেবা চায়ের কাপ বজলুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমকে আরেকটু চা দাও।

আপনি টুলটায় বসুন।

জেবা বসতে বসতে বলল, আমার কি ধারণা জান বজলু ? আমার ধারণা, আজও বাবা-মা, রেবা এসেছে। তারা মুহিবের খাটের পাশে বসে আছে।

'এসব আলোচনা থাক আপা।'

'আচ্ছা থাক। বজলু একটা কথা বল - মুহিব তো তোমার অনেক দিনের বন্ধু -'

'জ্বি।'

'আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সে অনেক কিছু তোমাদের বলতো। কি বলতো বলতো ?'

'সব সময় বলত এই পৃথিবীতে আপনার মত ভাল মেয়ে অতীতে কখনো জন্মায়নি। বর্তমানে নেই - ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।'

জেবার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমি জানতাম সে এই কথাই বলবে। তবু তোমার কাছে শুনতে চেয়েছি ভালই করেছি। অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদতে চাচ্ছিলাম, পারছিলাম না। এখন পারছি। তুমি ভাগ্য বিশ্বাস কর বজলু ?

বজলু কিছু বলল না।

জেবা বলল, আমি বিশ্বাস করি। এত বড় একসিডেন্ট হল। এতগুলি মানুষ গাড়িতে, কারোই কিছু হল না - মারা যাচ্ছে শুধু একজন। সেই একজন মাত্র একদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে। মৃত্যুটা দু'দিন আগে কেন হল না বলতো ? ওর মৃত্যুর পর কি হবে জান ? -চারদিক থেকে শুধু সান্ত্বনার বাণী শুনব। সুন্দর সুন্দর সব বাণী, চমৎকার সব কথা। "ইহকাল কিছুই না। ইহকাল হচ্ছে মায়া। আসল হচ্ছে পরকাল। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন মানুষের বোঝার উপায় নেই।" কি কি কথা শুনব সব আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি। আগেও তিনবার শুনেছি।

জেবা হয়ত আরো কিছু বলত - কথা থামিয়ে দিল। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে দু'জন ডাক্তার বেরুচ্ছেন। দু'জনের মুখই জ্যোতিহীন। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বলে দেয়া যায় - মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে এরা পরাজিত।

জেবা উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি ওকে দেখে আসি।

নার্স ছাড়াও একজন ডাক্তার মুহিবের পাশে আছেন। জেবা পায়ের কাছে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, ওর নিঃশ্বাসে এ-রকম শব্দ হচ্ছে কেন ? ডাক্তার সাহেব ওর কি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ?

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না।

জেবা বের হয়ে এল।

শফিকুর রহমান সাহেব এসেছেন। বাবার হাত ধরে প্রিয়দর্শিনী দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনই চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। জেবা তাদের দেখল, কিছু বলল না।

শফিকুর রহমান সাহেব বললেন, প্রিয়দর্শিনী তার মামাকে দেখার জন্যে খুব কান্নাকাটি করছিল। ওকে নিয়ে এসেছি।

এই প্রথম শফিকুর রহমান তাঁর মেয়েকে প্রিয়দর্শিনী নামে ডাকলেন। নাম উচ্চারণ করলেন স্পষ্ট করে, সুন্দর করে।

জেবা বলল, তোমার মামাকে এখন দেখে তোমার ভাল লাগবে না মা। না দেখাই ভাল।

প্রিদর্শিনী কঠিন স্বরে বলল, আমি দেখব।

'এসো আমার সঙ্গে।'

'আমি একা যাব।'

প্রিয়দর্শিনী ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দরজায় হাত রেখে মিষ্টি রিণরিণে গলায় বলল, আমি কি দু'মিনিটের জন্যে ভেতরে আসতে পারি ?

শফিকুর রহমান সাহেব ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করছেন। স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছেন না। স্বাভাবিক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, জেবা, ওর অবস্থা কেমন ?

জেবা বলল, অবস্থা ভাল না। ডাক্তাররা কিছু বলছেন না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। ওর গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। প্রিয়দর্শিনী একা একা গিয়েছে। ও ভয় পাবে।

শফিকুর রহমান বললেন, ও শক্ত মেয়ে, এতটুকুও ভয় পাবে না। আরেকটা কথা জেবা, তুমি নাকি চাও যে মেয়েটার সঙ্গে মুহিবের বিয়ে হয়েছে তাকে এখানে নিয়ে আসতে ?

‘হ্যাঁ।‘

‘সেটা কি ঠিক হবে জেবা ? এই ভয়ংকর ঘটনাটা মেয়ের আড়ালেই হওয়া কি ভাল না ? মেয়েটাকে তো একটা নতুন জীবন শুরু করতে হবে। তাকে যদি এখন এখানে নিয়ে আস তাহলে নতুন করে জীবন শুরু করা তার জন্যে খুব সহজ হবে না। সবচে‘ ভাল হয় কি জান ? যদি কেউ কোনদিন না জানে যে মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল। আমি খুব প্রাকটিক্যাল কথা বললাম জেবা। লিভ হার এলোন।‘

জেবা বলল, তুমি মুহিবের দিকটা দেখবে না ? তুমি কি মনে কর না মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে পাশে পাবার অধিকার তার আছে ?

শফিকুর রহমান জবাব দিলেন না। কোন জবাব তাঁর মাথায় এল না।

অরু জেগেই ছিল।

সে জানত আবরার যাবার আগে তার ঘরে একবার উঁকি দেবে। জ্বর কেমন জানতে চাইবে। কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখবে। সেটাই তো স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক আবরার তা করল না। জ্বর দেখতে চাইল না। লাজুক মুখে বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি - আজ আমার জন্মদিন। খুব ইচ্ছা ছিল তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব।

অরু বলল, আগে বললেন না কেন ? বললেই হত। কোথাও বেড়াতে যেতাম।

‘লজ্জা লাগল।‘

‘তখন লজ্জা লাগল তো এখন লাগছে না কেন ?‘

আবরার বলল, বুঝতে পারছি না। একটু বসি তোমার ঘরে ?

‘বসুন।‘

মীরু এসে বলল, অরু তোর টেলিফোন।

অরু বলল, কে ?

'জানি না কে ? একজন মহিলা। বললাম তোর অসুখ। শুয়ে আছিস। তারপরেও চাচ্ছেন। খুব না-কি জরুরি।'

অরু উঠে দাঁড়াল। আবরারকে বলল, আপনি কিন্তু নড়বেন না। আমি এক্ষুনি আসছি।

'হ্যালো, কে ?'

'আমাকে তুমি চিনবে না। আমার নাম জেবা। আমি মুহিবের বড় বোন ?'

অরু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, স্লামালেকুম আপা।

'তুমি কি এক্ষুণি, এই মুহূর্তে আসতে পারবে ?'

'কোথায় ?'

'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।'

'কি ব্যাপার আপা ?'

'মুহিব একসিডেন্ট করেছে।'

'অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অরু বলল, ওর কি জ্ঞান আছে ?'

'না, জ্ঞান নেই।'

'অরু ক্ষীণ গলায় প্রায় অস্পষ্ট ভাবে বলল, ওর অবস্থা খুব খারাপ, তাই না আপা ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আসছি।'

'আমি কি আসব তোমাকে নিতে ?'

'আপনাকে আসতে হবে না।'

জামিল সাহেব শোবার আয়োজন করছিলেন। অরু এসে দরজা ধরে দাঁড়াল। জামিল সাহেব বললেন, কি হয়েছে মা ? অরু ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে নিয়ে চল বাবা। আমি একা যেতে পারব না। আমি কিছুতেই একা যেতে পারব না।

অরু হাঁটু গেড়ে মুহিবের পাশে বসে আছে। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। সে চাপা গলায় বলল, ডাক্তার সাহেব, আমি কি ওর হাত একটু ধরতে পারি ?

বৃদ্ধ ডাক্তার কোমল গলায় বললেন, অবশ্যই ধরতে পার মা, অবশ্যই পার।

‘আমি যদি ওকে কোন কথা বলি তাহলে ওকি তা শুনবে ?‘

‘জানি না মা। কোমার ভেতর আছে, তবে মস্তিষ্ক সচল শুনতেও পারে। মৃত্যু এবং জীবনের মাঝামাঝি জায়গাটা খুব রহস্যময়। আমরা ডাক্তাররা এই জায়গা সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।‘

ডাক্তার সাহেব আমি ওকে কয়েকটা কথা বলব। আপনি কি আমকে কিছুক্ষণের জন্যে ওর পাশে থাকতে দেবেন ?

ডাক্তার সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে অরু একা। ছোট্ট ঘরটাকে তার সমুদ্রের মত বড় মনে হচ্ছে। মুহিবের বিছানায় সাদা চাদরের জন্যে বিছানাটাকে মনে হচ্ছে সমুদ্রের ফেনা। সেই ফেনা অবিকল ঢেউয়ের মত দুলছে।

অরু দুহাতে মুহিবের ডান হাত ধরে আছে। সে খুব স্পষ্ট করে ডাকল, এই তুমি তাকাও। তোমকে তাকাতেই হবে। আমি সব কিছুর বিনিময়ে তোমাকে চেয়েছিলাম। তোমাকে পেয়েছি। আমি তোমাকে চলে যেতে দেব না।

তোমাকে তাকাতেই হবে। তাকাতেই হবে।

॥ ১১ ॥

পঁচিশ বছর পরের কথা।

অরুর বড় মেয়ে রুচির আজ বিয়ে। বিরাট আয়োজন। ছাদে প্যাণ্ডেল হয়েছে। পাঁচশ'র মত মানুষ দাওয়াত করা হয়েছিল - ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হাজারের ওপর দাওয়াতী মেহমান এসে পড়েছে। সমস্যা হচ্ছে আকাশের অবস্থা ভাল না। সারাদিন ঝকঝকে রোদ গিয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই আকাশ মেঘলা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অরুর স্বামী আবরার সাহেব চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। খাওয়া কম পড়ে গেলে সমস্যা হবে। হোটেলে লোক পাঠিয়েছেন। খবর দিয়ে রাখা - প্রয়োজনে যাতে খাবার চলে আসে।

কিছু মেহমান খাইয়ে দিলে ভিড় পাতলা হত। খাওয়ানো যাচ্ছে না। কারণ বর এখনো আসেনি। বড় দেরি করছে। সন্ধ্যা সাত'টার সময় চলে আসার কথা - এখন বাজছে আটটা। আকাশের অবস্থাও আরো খারাপ করেছে। বৈশাখ মাস, ঝড়-বৃষ্টির কাল। তিরপল দেয়া আছে। ভারি বর্ষণ হলে তিরপলে কাজ হবে বলে মনে হয় না। এই নিয়েও আবরার সাহেব দুঃশ্চিন্তা করছেন। তাঁর প্রেসারের সমস্যা আছে। সামান্য দুঃশ্চিন্তাতেও তাঁর প্রেসার বেড়ে যায়। বর আসতে এত দেরি হবার কথা নয়। এত দেরি হচ্ছে কেন ?

বর এল রাত সাড়ে আটটায়।

অরুর মেজো মেয়ে কান্তা ছুটে এসে তার মা'কে বলল, বর এসেছে মা। কি কুৎসিত রুচি দেখলে তুমি বমি করে দেবে। কটকটের হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবী পরে এসেছে। গরম খুব, এই জন্যে না-কি সে আচকান পড়ে নি। পাঞ্জাবী দেখে আমার সব বন্ধুরা হাসাহাসি করছে।

অরু হাতের কাজ ফেলে বর দেখতে গেলেন। বরে মুখের দিকে তিনি তাকালেন না। তাকিয়ে রইলেন কটকটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবীর দিকে। তাঁর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। কান্তা বলল, কি হয়েছে মা, এ রকম করছ কেন ?

তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, শরীরটা ভালো লাগছে না মা। আমাকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দে তো।

বিয়েবাড়ির আনন্দ কোলাহল থেকে তিনি দূরে সরে গেলেন। ঘর অন্ধকার করে শুইয়ে রইলেন চুপচাপ। আবরার সাহেব খবর শুনে স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন। হাত রাখলেন মাথায়।

অরু বললেন, হাজারো কাজের সময় তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমি ভাল আছি। মাথাটা কেন জানি একটু ঘুরে উঠল।

আবরার সাহেব বললেন, কোন অসুবিধা নেই। আমি না গেলে কাজ আটকে থাকবে না।

‘ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। তিরপল না-কি ঝড়ে উড়ে গেছে। তুমি খোঁজ-খবর করবে না ?‘

‘খোঁজ-খবর করার লোক আছে। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো তো।‘

‘এত সব সমস্যা আর তুমি বসে আছ আমার ঘরে। লোকে হাসাহাসি করবে তো।‘

‘করুক হাসাহাসি।‘

রাত একটার মত বাজে। বিয়েবাড়ি মোটামুটি শান্ত হয়েছে। বরযাত্রীরা চলে গেছে। শুধু বর আর তার কিছু বন্ধু-বান্ধব রয়ে গেছে। এই বাড়িতে বাসর হবে। অল্পবয়স্ক মেয়েদের উৎসাহের সীমা নেই। তারা অকারণে চিৎকার ছোটাছুটি করছে।

কান্তার উৎসাহই সবচে‘ বেশি। যেন বাসরের যাবতীয় খুটি-নাটি সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে দেবার পুরো দায়িত্ব তার উপর। তার বার বছরের জীবনে এমন উত্তেজনার মুহূর্ত আসেনি। সে ছুটতে ছুটতে মা'র ঘরে এসে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এখন খুব মজা হবে মা। আপা করছে কি দুলাভাইয়ের পাঞ্জাবী আগুন দিয়ে পুড়াচ্ছে। ‘বন ফায়ার‘ হবে। সবার সামনে আগুন দিয়ে পুড়ানো হবে।

অরুর চোখে জল এসে যাচ্ছে। তিনি সেই জল সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। আজ তাঁর মেয়ের বিয়ে। এমন আনন্দের দিনে কি আর চোখের জল ফেলতে আছে ?

॥ সমাপ্ত ॥